

কন্যকা

চিত্তরঞ্জন ঘোষ



॥ বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী ॥

জীবিতেশ চক্রবর্তী
মায়া চক্রবর্তী

যুগলকরকমলেষু

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৫

প্রকাশক :

শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

২০, গ্রে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৫

মুদ্রক :

জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়

পি, এম্, বাক্‌চি এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ

ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস

৩৮এ, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্ কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা :

রেবতীভূষণ ঘোষ

দাম আড়াই টাকা

॥ সূচী ॥

এই লেখকের

কলাবতী

নহবৎ

কন্যকা



[একটি মধ্যবিত্ত বাড়ির ঘর। একপাশে একটা তক্তপোষ—সেখানে একটা সতরঞ্চি, স্তূপ-করা পড়ে রয়েছে। অন্যপাশে একটু ভেতর দিকে একটা টেবিল, গোটাকত চেয়ার। দেওয়ালে কয়েকটা ছবি, বেশীর ভাগই ঠাকুর-দেবতার, যার মধ্যে একটি হচ্ছে গণেশের।

পর্দা উঠতে দেখা গেল, টেবিলের ওপর একটা চেয়ার পেতে তার ওপরে দাঁড়িয়ে গাছ-কোমর বাঁধা একটি মেয়ে উঁচু দেওয়ালের ঝুল ঝাড়ছে। মেয়েটির বয়স বছর সাতাশ; বিবাহিত, কিন্তু এখন ঘোমটা দেওয়া নেই। দূরের ঝুল-কে নাগালে আনবার চেষ্টায় চেয়ার কাঁপিয়ে বার কয়েক পড়-পড় হল। মেয়েটি যখন তার ঝুল-নিষ্ঠায় বে-হুঁস তখন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক—প্রিয়নাথ—হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভেতর থেকে এ ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। ব্যস্তসমস্ত ভাব ভদ্রলোকের। হঠাৎ থেমে গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে ঘড়িটা দেখলেন।]

প্রিয়নাথ। ওঃ! বড্ডো দেরী হয়ে গেল! [হঠাৎ সতরঞ্চির দিকে চোখ পড়ে] নাঃ, এখনও ঘরটা সাজানো হ'ল না। কি যে সব করে! [নিজেই সতরঞ্চিটা পাততে গেলেন।]

নিভা। (চেয়ারের ওপর থেকে) বাবা ও থাক। আমি সব করেছি।

প্রিয়নাথ। আরে, তুই ওখানে কি করছিস? অ নিভু, শেষটা ঠ্যাং ভাঙ্গলে যে তোর শ্বশুর আমার ডুষবে।

নিভা। না বাবা, ডুষবে না। কিন্তু তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

প্রিয়। আমি যেখানেই যাই না তাতে তোর কি? কিন্তু তুই ওখানে উঠেছিস কেন পড়ে মরবার জন্যে, আগে তার জবাব দে।

নিভা। আঃ, আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এখন কোথায় বেরুচ্ছ, তা কিছু বলছ না কেন?

প্রিয়। আঃ গেল যা। বলি—আগে জবাব দেবে কে—আমি না তুই? বলি কে বড়, আমি না তুই? কে জিজ্ঞেস করেছে আগে—আমি না তুই?

নিভা। বাবা রে বাবা, একটু থামো তো! ঘরের ঝুল ঝাড়ছি, দেখতে পাচ্ছ না? তুমিই তো বললে ঝুল পরিষ্কার কোরতে।

প্রিয়। অ, বলেছি বুঝি। [একটু চুপসে গেলেন] তা বেশ, করো। ঝুল-ঝাড়া ভাল—বিশেষ দরকার। ভদ্রলোকেরা এসে নোংরা দেখলে বলবেন কি। কিন্তু তুই অত উচুঁতে কেন? শেষটায় পোড়ে-টোড়ে—

নিভা। তুমি এখন কোথায় বেরুচ্ছ?

প্রিয়। বিপনে ময়রাকে মিষ্টির কথা বোলে এসেছিলাম,

দেখে আসি ব্যাটা কতদূর কি কোরল! যেটি না দেখব সেটিই তো হবার যো নেই।

নিভা। ওঁরা যদি এসে পড়েন ?

প্রিয়। ওঁদের আগেই আমি এসে পড়ব। যাব আর আসব। মিষ্টিগুলো একটু দেখেশুনে আনা দরকার। বিজন বাবা-জীবন এসেছে—তাকেও তো একটু আদর-যত্ন করা উচিত। শুধু হবু জামাইর কথা ভাবলেই তো হবে না। তোর মা বেঁচে থাকলে অবশ্য আমায় এত ভাবতে হত না।

নিভা। মিষ্টিওয়ালার কাছে বরং প্রণবকে পাঠাও না।

প্রিয়। না, না। ওসব কর্ম ছেলে-ছোকরার নয়। তাছাড়া, ওকে যেতে হবে বাস-স্টপেজে। হ্যাঁ, ভাল কথা মন মনে পড়েছে। [চেঁচিয়ে] প্রণব, প্রণব, অ প্রণব।

[প্রণব বাড়ির ভেতর থেকে ঘরে এসে ঢোকে। তরুণ বয়স। একটু বেপরোয়া ভাব কথাবার্ত্তায়।]

প্রণব। আজ্ঞে, কি বোলছেন ?

প্রিয়। যাও, বাস-স্টপেজে গিয়ে দাঁড়াও গে যাও। বাগ-বাজারের ওঁরা নীতাকে দেখতে আসবেন আজ। একজন বুড়ো মত ভদ্রলোক, আর একজন ভদ্রমহিলা, ছেলের বাবা আর মা। সঙ্গে ছেলে নিজেও আসতে পারে। ভদ্রলোক একেবারে বাঘা বাপ—রিটায়ার্ড দারোগা। দেখিস, বুঝে-শুনে কথা বলিস।

প্রণব। কেন, বুঝে-শুনে কথা বলতে হবে কেন? তিনি দারোগা, আর আমি কি চোর নাকি?

প্রিয়। নিভা, বলি শুনলি তো গাধার কথাটা। ওরে মুখ্যু, আমরা যে মেয়েপক্ষ, আমাদের হাতজোড় করেই থাকতে হয়।

প্রণব। কেন, হাতজোড় করব কেন? অন্যায়টা কি করেছি আমরা?

প্রিয়। তর্ক কোরো না প্রণব, যাও।

প্রণব। এত তাড়াতাড়ি গিয়ে কি হবে? ওদের তো আসতে এখনও দেরী আছে।

প্রিয়। ফের তর্ক! যাও!

প্রণব। আজ্ঞে—

প্রিয়। কোন আজ্ঞে-টাজ্ঞে নয়, যা বলছি শোন।

নিভা। আমি ওকে পাঠাচ্ছি বাবা। তুমি চেঁচামেচি কোরো না। তোমার ব্লাডপ্রেসারটা আবার বেড়ে যাবে।

প্রিয়। বেড়ে যাবে কি, বেড়েছে। বুক ধড়ফড় কোরছে আমার।

নিভা। তবে থাক, এখন না-হয় না বেরুলে।

প্রিয়। [ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখে] তার কি উপায় আছে? বেরুতেই হবে। এই অকালকুষ্মাণ্ড, ওঁদের সঙ্গে ভদ্রভাবে ব্যবহার কোরবি। মুখ্যুটা আবার কি কোরে ফেলে ওদের সঙ্গে কে জানে! হয়তো

হাতাহাতিই সুরু কোরে দেবে। গোঁয়ার কোথাকার !

নিভা। তুমি এখন আর মাথা গরম কোরো না, বাবা ! তুমি এখন এসো গিয়ে।

প্রিয়। হ্যাঁ, চলি, তুই একটু এদিকটা দেখিস মা। মেয়ের বিয়ে—চারটিখানি কথা নয়। তা বুঝবে না এরা, দিলে দিনটা নষ্ট কোরে। এখন সারাটা দিন ভালয় ভালয় কাটলে হয়। জয় বাবা সিদ্ধিদাতা, জয় বাবা সিদ্ধিদাতা।

[প্রণাম কোরতে কোরতে প্রস্থান।]

নিভা। হ্যাঁরে, বাবা বুড়ো মানুষ, তুই বাবার সঙ্গে একটু ভাল কোরে কথা বোলতে পারিস না ?

প্রণব। তুমি থামো তো দিদি। এসেই একেবারে গার্জিয়েন হ'য়ে বোসলে !

নিভা। [ক্ষুণ্ণ হ'য়ে] তোদের সঙ্গে কথা বলাই এক ঝকমারি।

[প্রবলবেগে সম্মার্জনী-চালনা সুরু কোরে দেয়।]

প্রণব। আঃ, তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না দিদি।

নিভা। আমার বোঝার দরকার নেই বাপু। তুমি যাও।

প্রণব। আহা শোনই না।

[বাড়ির ভেতর থেকে 'দিদি দিদি' বোলে ডাকতে ডাকতে নীতা ঢোকে। বছর কুড়ি বয়স—পরিচ্ছন্ন চেহারা। চঞ্চল গতিতে ঢুকে ঝাঁটার ধূলোয় থমকে দাঁড়ায়]

নীতা। দিদি, তোমায় জামাইবাবু ডাকছেন।

নিভা। কেন ?

নীতা। পাঞ্জাবি খুঁজে পাচ্ছেন না।

নিভা। স্যুটকেশের মধ্যেই রয়েছে তো।

নীতা। [মৃদু হেসে] থাকলে হবে কি! তুমি না গেলে খুঁজে পাবেন না বোলে প্রতিজ্ঞা কোরে বোসে আছেন যে।

নিভা। বড় ফাজিল হয়েছিস তো তুই নীতা।

নীতা। [একটু ভেবে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুরে] তা আজকাল একটু হ'য়েছি, তোমার কাছে মিথ্যে বোলব না দিদি। তবে খুব বেশী নয়।

নিভা। ইয়ার্কি করিস না নীতা। তার চেয়ে চেয়ারটা একটু ধর, লগবগ কোরছে।

[নীতার সাহায্যে নেমে এসে বাড়ির মধ্যে চলে যায়]

নীতা। [প্রণবের কাছে গিয়ে কাঁদ-কাঁদ সুরে] দাদা, কি হবে ?

প্রণব। বিয়ে হবে তো শুনতে পাচ্ছি।

নীতা। তুমি দেখে নিও, আমি ঠিক আত্মহত্যা কোরব।

প্রণব। এখুনি দেখছি, কর না আত্মহত্যা, কর। হুঁ, মুখে বলা যতটা সহজ কাজে ততটা নয়।

নীতা ॥ [অনুনয়ের সুরে] দিদিকে একটু বল না।

প্রণব ॥ বোলব-বোলব তো কোরছি অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু বলি কখন! সে যে এসে ইস্তক ঝাঁটা হতে গার্জিয়েন সেজে

বোসে আছে, কথা বলে কার সাধ্যি ! [বাইরে পুরুষ-কণ্ঠের ডাক শোনা গেল, 'প্রণব, প্রণব।']

নীতা ॥ ধীরেশদা না ?

প্রণব ॥ তাই তো মনে হোচ্ছে।

নীতা ॥ আমি চললুম। [প্রস্থান]

[ধীরেশ ঢোকে। সার্ট-প্যাণ্ট্-পরা স্মার্ট ছেলে—প্রণবের সমবয়সী বন্ধু।]

ধীরেশ ॥ কি ব্যাপার রে ?

প্রণব ॥ ব্যাপার খুবই গুরুতর।

ধীরেশ ॥ আমার একটা প্ল্যান আছে। আমার মনে হয়—

প্রণব ॥ থাক, থাক, এখানে তোমার কিছু না মনে হওয়াই ভাল। বরং মনে রাখা ভাল যে এটা তোমার শত্রুপুরী, এবং দেওয়ালেরও কান আছে। তুই বাইরে গিয়ে দাঁড়া, আমি জামাটা পরে আসছি, বাইরে বেরোব।

[প্রণব বাড়ীর মধ্যে চলে যায়। ধীরেশ চিন্তিতমুখে একটু দাঁড়িয়ে থেকে ধীর পদক্ষেপে বাইরে যাবার উপক্রম করে। হঠাৎ পেছন থেকে নীতা ঢোকে।]

নীতা ॥ ধীরেশদা।

ধীরেশ ॥ কে, নীতা !

নীতা ॥ কি হবে ধীরেশদা ?

ধীরেশ ॥ দেখি তো কি হয়।

নীতা ॥ (ধীরেশের উদাসীন উত্তরে ক্ষুণ্ণ) বেশ।

ধীরেশ ॥ বেশ কি ?

নীতা ॥ আমার বিয়ে হোয়ে যাবে।

ধীরেশ ॥ হবেই তো।

নীতা ॥ (অভিমান-ক্ষুব্ধ ও ক্রন্দনোন্মুখ) বেশ তাই হোক। (বাড়ীর ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।)

ধীরেশ ॥ শোন, শোন। (নীতা তার দিকে তাকায় না, কিন্তু থামে।) বিয়ে হোক তা কি তুমি চাও না ? (নীতা মুখ ফিরিয়ে তীব্র একটি কটাক্ষ হেনে আবার চোখ সরিয়ে নেয়।) পাত্র নিয়েই তো যত গোলমাল ! তোমার অভীষ্ট পাত্রটিও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তার চেষ্টার কোন কমতি নেই—এইটুকু অন্তত বিশ্বাস কর।

নীতা ॥ চেষ্টা না ঘোড়ার ডিম।

ধীরেশ ॥ একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।

নীতা ॥ প্ল্যান না হাতী।

ধীরেশ ॥ আচ্ছা, তুমি হাতী-ঘোড়া ছাড়া কথা বল না কেন বল তো ?

নীতা ॥ মুখে সব সময় তুমিই তো হাতী-ঘোড়া মারো। এদিকে মুরোদ নেই এক কড়া।

ধীরেশ ॥ ভ্যাখো, আমার সুপ্ত পৌরুষ কিন্তু জেগে উঠে সিংহের মত গর্জন কোরে উঠবে।

নিভা ॥ (নেপথ্য-কণ্ঠে) নীতা।

নীতা ॥ (জোরে) কি ? (আস্তে) দোহাই, আর গর্জন কোরো না।

নিভার নেপথ্য-স্বর ॥ নীতা, কে এসেছে, কার সঙ্গে কথা বলছিস তুই ?

নীতা ॥ এই—ইয়ে—ঘুঁটেওয়ালার সঙ্গে।

ধীরেশ ॥ অ্যাঁ !

নীতা ॥ (ধীরেশকে বাইরে যেতে ইসারা কোরে চুপি-চুপি স্বরে) পালাও। দিদি আমাদের একসঙ্গে এখানে দেখে ফেললে মোটেই খুশী হবে না। (ধীরেশের প্রস্থান)

নিভার নেপথ্য-স্বর ॥ কে বললি ?

নীতা ॥ ঘুঁটেওয়ালা। (হাসতে থাকে)

নিভার নেপথ্য-স্বর ॥ ওকে এখন যেতে বলে দে।

নীতা ॥ ঘুঁটেওয়ালা, তুমি আজ চলে যাও। আজ আমাদের ঘুঁটের দরকার নেই। তুমি বরং সেই পরশু নাগাদ এসো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পরশু, মঙ্গলবার।

(নীতার অলক্ষ্যে তার কথার মধ্যেই প্রণব ঘরে ঢোকে —সার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে হঠাৎ বিস্ময়ে তার হাত থেমে যায়।)

প্রণব ॥ এই, নীতা, তুই কার সংগে কথা বলছিস রে ? এখানে ঘুঁটেওয়ালা কোথায় ?

নীতা ॥ [হেসে একেবারে ফেটে পড়ে] বাইরে আছে দ্যাখ না।

[বিস্মিত প্রণবের প্রস্থান। নীতা হাসতে থাকে মুখে আঁচল দিয়ে। নিভা ঢোকে।]

নিভা ॥ একি রে ! তুই একা একা হাসছিস কেন ? পাগল হলি নাকি ?

[নীতা হাসতে হাসতে বাড়ীর ভেতরে ঢোকার জন্যে ছোটে। দরজার মুখে বিজনের সংগে তার একেবারে মুখোমুখি। বিজন নীতার উদ্দাম গতি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সন্ত্রস্ত হ'য়ে সরে দাঁড়ায়—চোখে তার বিস্মিত জিজ্ঞাসা। নীতা তাকে একটি ভেংচি কেটে আরো বিমূঢ় কোরে দিয়ে চোলে যায়। নিভার দৃষ্টি নীতার গতিপথ অনুসরণ কোরে বিজনের মুখে এসে হোঁচট খায়।]

নিভা ॥ তুমি এ ঘরে এই ধুলোর মধ্যে চোলে এলে যে।
[ঝাঁটাটা তুলে নেয় নিভা]

বিজন ॥ কি আর করি! শ্বশুরবাড়ী এসে একেবারে বেকার বনে গেলাম যে! তুমি চোলে এলে কাজে, এখন আমি কোন ভ্যারাণ্ডা-টা ভাজি? কি করি এখন?

নিভা ॥ [হাতের ঝাঁটার দিকে তাকিয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে] আপাততঃ তুমি পিঠটা পেতে দিতে পার।

বিজন ॥ [মাথাটা সামনে হেলিয়ে] তুমি বোললে পিঠ তো ছার, আমি মাথা পেতে দিতে পারি। [নাটকীয় সুরে] আমার মাথার ওপর নামুক তোমার দাক্ষিণ্য। (চায়ের পেয়ালা-পিরিচ হাতে নীতা ঢোকে।)

নীতা ॥ ওকি জামাইবাবু, গড় কোরছেন কেন?

বিজন ॥ (মাথা তুলে) তাতে তোমার ক্ষোভ কি বালিকা? তোমাকে গড় করবার লোকও তো এনে দিচ্ছি।

নীতা ॥ তাই নাকি? অজস্র ধন্যবাদ। আপনি আমার জন্যে

এতটা কষ্ট স্বীকার কোরছেন বোলেই তো আমিও আপনার জন্যে খানিকটা কষ্ট স্বীকার করছিলুম।

বিজন ॥ যথা ?

নীতা ॥ এই যে—চা তৈরী কোরে নিয়ে এলুম। এটি গ্রহণ কোরে আমায় ধন্য করুন।

বিজন ॥ কোরলুম। (পেয়ালা নিয়ে একটি চুমুক দিয়ে) কিন্তু বালিকা, তোমার বিনয় তো সাংঘাতিক।

নীতা ॥ কেন ?

বিজন ॥ কে বোললে, এটি চা ?

নীতা ॥ (একটু ভীত) কেন, চিনি কম হোয়েছে বুঝি ?

বিজন ॥ সে-কথা নয়।

নীতা ॥ দুধ কম হোয়েছে ?

বিজন ॥ সে কথাও বোলেছি না আমি।

নীতা ॥ লিকার-টা লাইট হোয়েছে ?

বিজন ॥ তাও বোলতে চাই না আমি।

নীতা ॥ তবে কি বোলতে চান দয়া কোরে ব্যক্ত করুন।

বিজন ॥ এটি চা নয়।

নীতা ॥ (সশঙ্ক) তবে ?

বিজন ॥ অমৃত। স্রেফ হাতের গুণে।

নীতা ॥ (ডান হাতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে) হাতটা রক্ত-মাংসেরই তো মনে হচ্ছে। দেবত্ব কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো।

বিজন ॥ পাবে না। বৃথা চেষ্টা করো না। পরশমণির কথা

শুনেছ তো, তার ছোঁয়ায় সব সোনা হ'য়ে যায়, সেটা কিন্তু সোনা নয়, পাথর। তোমার হাতও সেই পরশ-মণি। (এক পলক নিভাকে দেখে নিয়ে) অবশ্য তোমাকে এতটা প্রশংসা করে কাজটা ভাল কোরলুম না। তুমি তো একদিন আমায় অমৃতের স্বাদ দিলে, বাকী রোজই তো আমায়—

নিভা ॥ আমার হাতে বিষ খেতে হয়, তাই না ?

বিজন ॥ আহা-হা, আমি কি তাই বোললুম ?

নিভা ॥ সব কথা বোলতে হয় না, এমনিতেই বোঝা যায়। রোজ যদি তুমি বিষই খাও, তবে বেঁচে আছো কি করে ?

বিজন ॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) নেহাৎ নীলকণ্ঠ বোলে।

নিভা ॥ ছ্যাখো, বেশী বাজে বোকো না, আমাদের কাজ আছে। চল্ নীতা, তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি দুজনে। বড্‌ডো দেরী হোয়ে গেল।

বিজন ॥ আমার তো হোয়েছে সেইটাই মুস্কিল। কাজ কোরতে চাই, অথচ একটা কাজ পাচ্ছি না, একদম বেকার।

নিভা ॥ আহা ঐ অমৃতটুকু পান করো না—সেটাও তো একটা কাজ।

বিজন ॥ ঠিক কথা। তিন মিনিটের জন্যে একটা চাকরি পাওয়া গেল।

(বিজন চা পানে মন দেয়। চুমুকের ফাঁকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে থাকে ওদের টেবিলে ওঠার কসরৎ।)

নিভা ॥ টেবিলে দাঁড়িয়ে বিজনের মুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য কোরে) হ্যাঁ কোরে কি দেখছ ?

বিজন ॥ সার্কাস্ ।

নিভা ॥ যাও, বেরোও এখান থেকে ।

বিজন ॥ সেই ভাল । (পেয়ালা নামিয়ে রাখে) এদিকে যখন এলামই তখন যাই নগেনের সঙ্গে একটু দেখা কোরে আসি । বিয়ের পর থেকে বন্ধুদের তো সব ভুলেই গেছি । যাই ।

নিভা ॥ যাও, তবে দেখো, বন্ধুদের পেয়ে আবার বাড়ী ফিরতে ভুলো না যেন । আড্ডা পেলে তো আর কিছু মনে থাকে না । (বিজনের প্রস্থান)

নিভা ॥ গেল তো বেরিয়ে । বাড়ীতে কেউই রইল না ওঁরা যদি কেউ এসে পড়েন, কথা বলবে যে কে !

নীতা ॥ কেন, তুমি বোলবে ।

নিভা ॥ না বাপু, আমি যার তার সঙ্গে অমন কথা বোলতে পারি না । যাকগে, বাবা এখুনি এসে পড়বেন ।

নীতা ॥ যার-তার সঙ্গে তুমি কথা বোলতে পারো না, আর সেই যার-তার কাছে আমায় ঠেলে পাঠাচ্ছ ।

নিভা ॥ শ্বশুরঘরে সব মেয়েকেই যেতে হয় নীতা । ও সব কথা এখন থাক । তাড়াতাড়ি হাত চালা । এর পর আবার তোর মাজা-ঘসায় তো আমার লাগবে পাকা একটা ঘণ্টা ।

নীতা ॥ কেন আমি কি উনুনে-পোড়া হাঁড়ি ?

নিভা ॥ আহা, তা কে বোললে ? তবে, আজ মা নেই বোলে

তোকে তো আর আমি এই সাজে মানুষের সামনে বার কোরতে পারি না।

নীতা ॥ বেশ পারবে। আমি এ কাপড় পালটাবই না। এই যেমনটি আছি, ব্যস। আমি যা, ঠিক সেইভাবেই দেখবেন। পছন্দ হয় হবে, নইলে বিয়ে হবে না।

নিভা ॥ ছেলেমানুষী করিস না নীতা। বাবা এখন বুড়ো হয়েছেন, তাঁকে—।

(নেপথ্যে 'প্রিয়নাথবাবু, প্রিয়নাথবাবুর বাড়ী এটা ?' প্রিয়নাথবাবু' ইত্যাদি। ডাকতে ডাকতেই প্রবেশ করেন তারকবাবু। সবল প্রবীণ। গলায় চাদর—পাকানো ! হাতে বাঁশের মত মোটা একটা লাঠি। দুধ ছেঁকে নেওয়া যেতে পারে এমন একটি ছাঁকনি গোঁপ বক্রাকারে ঠোঁট দুটি ঢেকে রেখেছে।)

তারকবাবু। (টেবিলের ওপর নিভা ও নীতাকে দেখে) ও, মা লক্ষ্মীরা ! এটা কি প্রিয়নাথবাবুর বাড়ী ?

(উভয়ে তাড়াতাড়ি নামে।)

নিভা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা প্রিয়নাথবাবু—

তারক ॥ তিনি কোথায় ? ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। (লাঠিটা ঠোকেন—বিরক্তির প্রকাশ ওটা।)

নিভা ॥ আজ্ঞে, তিনি একটু বাইরে গিয়েছেন।

তারক ॥ (ক্ষুব্ধ) অ, বাইরে গিয়েছেন ! বেশ আমি একটু ঘুরে আসছি।

নিভা ॥ আপনার নামটা ?



তারক ॥ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

নিভা ॥ কোথা থেকে আসছেন ?

তারক ॥ সে খোঁজে কোন দরকার নেই। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসব আবার। যা বলবার তা প্রিয়নাথবাবুকেই বোলব। (ক্ষুব্ধভাবে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে প্রস্থান)

নিভা ॥ এই বোধহয় সেই দারোগা। কি মুস্কিল হোলো বল তো। বাড়ীতে কেউ নেই যে একটা কথা বলে। ভদ্রোলোক বোধহয় রেগে গেছেন। আমরা তো তখন টেবিলে সওয়ার হোয়ে বোসে আছি। ছিঃ ছিঃ, কি ভাবলেন বল তো।

নীতা ॥ কি আর ভাববেন ! ভাবলেন মেয়ে দুটি নিশ্চয়ই হাড্‌ল্‌ রেসে ফার্স্ট হয়। সেটা তো ডিস্‌কোয়ালিফিকেশন্‌ নয়। স্বাস্থ্যচর্চা তো ভাল জিনিষ !

নিভা ॥ ইয়ারকি করিস না নীতা। আমি ভাবছি, এর পরে ওঁর সামনে আমিই বা বেরোব কি করে, তোকেই বা বার করব কি করে।

নীতা ॥ বার করবার জন্যে তোমায় মাথার দিব্যি দিচ্ছে কে ? এক কাজ কর। তুমিও বেরিও না, আমায়ও বের কোরো না। জয় বাবা সিদ্ধিদাতা। (হাত জোর করে)

নিভা ॥ দ্যাখ্‌ নীতা, ফাজলামি সব সময় ভাল লাগে না।

নীতা ॥ (অত্যন্ত নিরীহভাবে) কোন্ কোন্ সময় ভাল লাগে ?

নিভা ॥ (কটমট কোরে তাকিয়ে) অসভ্য !

(বুড়ো ঘুঁটেওয়ালা ঢোকে। ঝাঁকাটা মাথা থেকে নামায়)

ঘুঁটেওয়ালা ॥ দিদিমণি, ঘুঁটে লাও গো, এ হপ্তায় আসতে বলেছিলে।

নিভা ॥ আ গেল যা। এই মাত্তর যে তোমায় বলে দেওয়া হোলো—আজ আমাদের সময় হবে না। একদিনে তুমি ক'বার আসবে ?

ঘুঁটেওয়ালা ॥ অ্যায় ছ্যাখো, কাকে কি বোলছো গো দিদিমণি ? আজ আমি আবার কখনও এনু গো ?

নিভা ॥ এই মাত্তর তো এসেছিল। যাও, এখন ঝামেলা করো না বাপু।

ঘুঁটেওয়ালা ॥ এই মাত্তর ! (বিভ্রান্ত) আমি তো বাড়ী থেকে বেরুলমই এই মাত্তর।

নিভা ॥ ওঃ, ভাল জ্বালায় পড়া গেল।

ঘুঁটেওয়ালা ॥ যাচ্ছি গো দিদিমণি, যাচ্ছি। (অনেকটা নিজের মনে) কিন্তু আজ আমি আবার কখন এনু গো ?

নীতা ॥ এসেছিলে গো এসেছিলে। ভুলে গিয়েছ—বয়েস হোয়েছে তো।

ঘুঁটেওয়ালা ॥ (অসহায়ভাবে) তা হবে। এইছিনু বোধ হয়—তোমরা যখন বোলছ।

নীতা ॥ আমরা বোলছি কি গো ! ধর, আমরা কিছু বল্‌লুম না। তাহলেই কি তোমার আগের বারের আসাটা মিথ্যে হোয়ে গেল ?

ঘুঁটেওয়ালা ॥ (বিপন্ন) আগের বারের আসা !

নীতা ॥ হ্যাঁ গো এরি মধ্যে ভুলে গেল ? তুমি এলে, ঝাঁকাটা নামিয়ে রেখে আমায় জিজ্ঞেস কোরলে, 'ঘুঁটে লেবে গো !'

ঘুঁটেওয়ালা ॥ (খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে) হুঁ-হুঁ, তারপরে ?

নীতা ॥ মনে পড়ছে তাহলে। তারপরে আমি বললুম, না গো, আজ আমরা ঘুঁটে নেব না। আমাদের ঘুঁটে আছে। তুমি বরং পরশু এসো—মঙ্গলবার।

ঘুঁটেওয়ালা ॥ তা হবে বাপু। বুড়ো হয়েছি, সব এখন মনে থাকে না। আমি ভাবছিনু, একটু আগে আমি ঐ বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ী গিইচি। তা'হলে আসলে তখন বাঁড়ুজেদের বাড়ী যাই নি ?

নীতা ॥ না গো।

ঘুঁটেওয়ালা ॥ তখন আমি তা'লে তোমাদের বাড়ী এইচি ?

নীতা ॥ হ্যাঁ। তুমি এখন বরং একবার হরনাথ বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ী চলে যাও।

ঘুঁটেওয়ালা ॥ তাই যাই। কি ভুলো মনই হোয়েচে ! আমার এখনও মনে হচেছ, আমি তোমাদের বাড়ী আজ আসিনি, বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ী গিইচি।

(ঝাঁকা তুলে নিয়ে চোলে যায়। নীতা হাসতে থাকে।)

নিভা ॥ হাসবার কি হোলো ? বুড়ো মানুষ, ভুলে এসে পড়েছে, তাতে হাসবার কি আছে ? চল্, তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেলি, বুড়ো দারোগাটা আবার এখুনি আসবে। (দুজনে টেবিলে ওঠে)

নিভা ॥ হ্যাঁ, ঐ দিকটা ভাল করে—

নীতা ॥ হাতে নাগাল পাচ্ছি না যে—

নিভা ॥ টেবিলটা ওদিকে সরিয়ে নেব ?

(প্রণব, বিনোদবাবু, কামিনীদেবী, যাদুগোপালের প্রবেশ। বিনোদবাবু ভীরু প্রকৃতির লোক—বৌয়ের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। কামিনী দেবী একটি সচল পর্বত, তাঁর দাপটে আশেপাশে সর্বদা ভূকম্পন অনুভূত হয়। প্রণবের পরে তিনি, পেছনে জড়সড় হোয়ে বিনোদবাবু। তারপরে যাদুগোপাল—বোকামি ও লজ্জায় জড় তার ব্যবহার।)

প্রণব ॥ আসুন, আসুন।

কামিনী ॥ (এদিক ওদিক তাকিয়ে গৃহসজ্জা দেখতে দেখতে অকস্মাৎ—) ওরা কারা! অ, বুঝেছি, ওটিই বুঝি মেয়ে? খুব ধিঙ্গি আছে তো মেয়েটা। অবশ্য এক দিক দিয়ে ভালই হোলো। খাঁটি মুখটাই দেখা গেল; ব্রাসো দিয়ে ঘসা মুখ দেখতে হোলো না। (স্বামীকে) কি, তুমি কথা বলছ না যে।

বিনোদ ॥ (মোসাহেবের মত) হ্যাঁ, তা তো বটেই, ভালই হোলো, ভালই হোলো। (ততক্ষণে নিভা ও নীতা নেমেছে)

নিভা ॥ ও অন্তত হাতমুখটা ধুয়ে আসুক। নোংরা ঘেঁটেছে।

কামিনী ॥ (নীতার মুখটা ভাল কোরে দেখে নিয়ে আদেশের ভঙ্গীতে) আচ্ছা যাও। আমি আবার নোংরা দেখতে পারি না। (নিভা ও নীতার প্রস্থান)

প্রণব ॥ আপনারা বসুন।

কামিনী ॥ বসছি। তুমি বুঝি মেয়ের ভাই ?

প্রণব ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। দাদা।

কামিনী ॥ তুমি বেশ চালাক-চতুর আছো মনে হোচ্ছে।

প্রণব ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আছি আপনাদের আশীর্ব্বাদে। কিন্তু আপনারা এত তাড়াতাড়ি টের পেলেন কি করে ?

কামিনী ॥ (স্বামী পুত্রকে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে) তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

বিনোদ ॥ তুমি বোসলে না—

কামিনী ॥ (ধমকের সুরে) তাতে কি হোয়েছে—বোসো। (বেত্র-তাড়িত ছাত্রের মত ওরা বোসে পড়ে) হ্যাঁ কি ব'লছিলে—টের পেলুম কি কোরে ; ও আমরা বুঝতে পারি ! এই তো, তুমি টের পেলে কি করে যে আমরা মেয়ে দেখতে আসছি ?

প্রণব ॥ সেটা কিছু শক্ত নয়। বাবা আপনাদের কথা আমায় বোলে দিয়েছিলেন। আমি বাস থেকে নামতে দেখেই বুঝেছিলুম। তারপরে জিজ্ঞেস করতে আপনি যখন বললেন যে আপনারা বাগবাজার থেকে আসছেন মেয়ে দেখতে তখন আর সন্দেহ রইল না।

কামিনী ॥ তবে এটা কি কম বুদ্ধির কথা হোলো। ঠিক দেখেই চেনা। (বিনোদবাবুকে) তাহলে মেয়েও বুদ্ধিমতী হবে আশা করা যায় কি বল ?

বিনোদ ॥ বটেই তো, বটেই তো। (নীতাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ)

কামিনী ॥ মেয়ের মাকে দেখছি না তো। তিনি বুঝি ওঁর (বিনোদবাবুকে দেখিয়ে) সামনে বেরুবেন না।

নিভা ॥ না, না, তা নয়। মা কয়েক বছর হোলো স্বর্গগত হ'য়েছেন।

কামিনী ॥ তাই নাকি! আমরা যেন্ অন্যরকম শুনেছিলাম মনে হচ্ছে। থাকগে, মেয়ের মা থাকলেই বা কি, ম'লেই বা কি! মেয়ের বাপকেও তো দেখছি না।

নিভা ॥ তিনি একটু কাজে বেরিয়েছেন এক্ষুনি এসে পড়বেন।

কামিনী ॥ এটা তো দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। মেয়েও তা হলে দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে।

বিনোদ ॥ বটেই তো, বটেই তো।

কামিনী ॥ (নীতাকে) এদিকে এসো তো মা।

(নতমুখী নীতা এক পা এগোয়। কামিনী দেবী তার চেয়ে অনেক দ্রুত এগিয়ে এসে নীতার হাত-গাল ঘষতে থাকেন।)

কামিনী ॥ না, মেকি নয়। রংটা ঠিকই। জোচ্চুরী নয়।

বিনোদ ॥ তাহলে তো ভালই, বেশ ভালই।

কামিনী ॥ আজকাল সব জিনিষে এত ভেজাল যে মেয়েদের রংটাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করবার যো নাই।

বিনোদ ॥ বটেই তো, বটেই তো।

কামিনী ॥ চুলটা খোলো তো মা। (নিজেই চুল খুলে ছাখেন) চুলের জাত তত সুবিধে নয়। খালি ধ্যাড়ধেড়ে লম্বা—গোছ নেই তেমন। (চুলের দৈর্ঘ্যটা মাপবার

ভঙ্গীতে দেখে) লম্বা হচ্ছে গিয়ে—(স্বামীকে) দেখি ফিতেটা। (বিনোদ খুব ব্যস্তভাবে পকেট থেকে একটা মাপবার ফিতে বার কোরে কামিনীদেবীর হাতে দেয়)।

কামিনী ॥ (চুল মাপতে মাপতে) এক ফুট, দুই—আড়াই—হাঁ আড়াই ইঞ্চি। এক ফুট আড়াই ইঞ্চি। বরানগরের মেয়েটার চুল অবিশ্যি এর চেয়ে বড় ছিল। যাই হোক, টুকে নাও নইলে তোমার মনে থাকবে না। তোমার মাথায় তো গোবর পোড়া।

বিনোদ ॥ বটেই তো, বটেই তো। (তাড়াতাড়ি কাগজ-কলম বার কোরে টুকতে থাকেন।) চুলের দৈর্ঘ্য—

কামিনী ॥ (মেয়ের দৈর্ঘ্য মাপতে সুরু কোরেছেন) পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি।

বিনোদ ॥ চুলের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি।

কামিনী ॥ অ্যাঁ! তোমার মাথা।

বিনোদ ॥ (মাথা চুলকে) কেন, আমার মাথার আবার কি হল ?

কামিনী ॥ চুল কারো পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা হয় ?

বিনোদ ॥ [ধমক খেয়ে কাঁদ-কাঁদ] তুমিই তো বোললে।

কামিনী ॥ তোমার মাথা।

বিনোদ ॥ আমি অতশত বুঝি না। তুমি আমায় বোলে দাও কি লিখতে হবে।

কামিনী ॥ লেখ। চুল—এক ফুট আড়াই ইঞ্চি। আর মেয়েটা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। (প্রণবকে) ছাখো

বাবা, আমরা কিন্তু আমাদের নিজেদের একজন ডাক্তার পাঠাব—তিনি মেয়ে দেখে যাবেন।

প্রণব ॥ ডাক্তার কেন ?

কামিনী ॥ মেয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা তো ভাল বুঝি না, তাই—

প্রণব ॥ হ্যাঁ, সে তো খুবই ভাল কথা। আমরাও একজন ডাক্তার পাঠাব ভেবেছি ।

কামিনী ॥ কেন, কেন ?

প্রণব ॥ ছেলের স্বাস্থ্যটা পরীক্ষা কোরে আসবে—মানসিক স্বাস্থ্য। মানসিক রোগগুলো আবার বংশানুক্রমিক কি না—তাই ভয়ের ব্যাপার।

কামিনী ॥ আমাদের বংশে কারুর স্বাস্থ্য খারাপ নয়।

প্রণব ॥ (খুব বিনয়ের সঙ্গে) আজ্ঞে হাঁ, সে তো আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি।

কামিনী ॥ (খুশী হোয়ে) আমার স্বাস্থ্য আগে আরো ভাল ছিল ।

নিভা ॥ ও সব কথা এখন থাক। আপনি মেয়েকে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরবেন না ?

কামিনী ॥ নিশ্চয়ই কোরব। (নীতাকে) তুমি রাঁধতে জান ?

নীতা ॥ হ্যাঁ।

কামিনী ॥ আচছা বল তো বিরিয়ানি কেমন কোরে রাঁধবে ?

প্রণব ॥ (বিনয়ের ভঙ্গিতে) আপনারা বুঝি বাড়ীতে রোজ বিরিয়ানি খান ?

কামিনী ॥ না, ঠিক তা নয়। তবে জানা থাকাটা দরকার।

প্রণব ॥ হ্যাঁ, সে তো বটেই, তবে কি জানেন, ও যদি এখন 'সহজ পাকপ্রণালী, থেকে মুখস্থ বোলে যায় গড়গড় কোরে, তাহ'লে তো আপনি ধোরতে পারবেন না। তার চেয়ে বরং একদিন ওর রান্না খেয়ে যাবেন আপনারা, আপনাদের নেমন্তন্ন রইল।

কামিনী ॥ আচ্ছা। (নীতাকে) তুমি গান গাইতে জান ?

নীতা ॥ অল্প অল্প।

কামিনী ॥ গাও তো একটা। (নীতা একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত ধরে। গানের মধ্যেই বলে) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জান ?

নীতা ॥ না।

কামিনী ॥ তবে আর গানের কি জান! উচ্চাংগ-সংগীতই তো আসল। নইলে ঐ ঘ্যানঘেনে রবীন্দ্র-সংগীত আর প্যানপেনে আধুনিক—ওকে কি আর গান বলে! আহা বেলেঘাটার মেয়েটা উচ্চাঙ্গ-সংগীত ভাল জানত। (অকস্মাৎ স্বামীকে) তুমি টুকে নিচ্ছ তো সব ?

বিনোদ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কামিনী ॥ [নীতাকে] নাচতে জান তুমি ?

নীতা ॥ আজ্ঞে না।

কামিনী ॥ [স্বামীকে] টুকে নিচ্ছ তো ?

বিনোদ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কামিনী ॥ কালীঘাটের মেয়েটা ভাল নাচতে জানত। যাক্‌গে। [নীতাকে] কিছু বাজাতে পার ?

নীতা ॥ না।

কামিনী ॥ সেতার? এস্রাজ? বেহালা? গীটার? কিছু না?

প্রণব ॥ না, গ্রামোফোন ছাড়া ও কিছু বাজাতে পারে না।

কামিনী ॥ নাঃ, মেয়েটি মোটেই অ্যাকম্‌প্লিস্‌ড নয়। আচ্ছা তুমি কি পড়?

নীতা ॥ বি-এ।

কামিনী ॥ বি-এ! [স্বামীকে] সেই বানানটা যেন কি?

বিনোদ ॥ [চুপি চুপি বলার ভংগিতে] সোপেনহাওয়ার।

কামিনী ॥ হ্যাঁ, সোপেনহাওয়ার বানান কর তো। তাড়াতাড়ি।

নীতা ॥ এস-এস-এইচ্‌—

কামিনী ॥ উঁহু, হোলো না।

নীতা ॥ এস-সি-এইচ্‌—

কামিনী ॥ [সেদিকে কর্ণপাত না কোরে নিভাকে] মেয়ের বাপ তো এলেন না এখনও। দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারটা তো আলোচনা করা গেল না।

নিভা ॥ মেয়ে আপনাদের পছন্দ হোলে দেওয়া-থোয়ার কথাটা আলোচনা করা যাবে বরং।

প্রণব ॥ আহা-হা দিদি তুমি বুঝতে পারছ না। অনেক সময় দেওয়া-থোওয়ার ওপরেই যে পাত্রী পছন্দ-অপছন্দ নির্ভর করে।

কামিনী ॥ অ্যায়, ঠিক বোলেছ বাবা। এ ছেলের খুব বুদ্ধি— আমি আগেই বলেছি।

প্রণব ॥ ছেলে সম্পর্কে আমাদেরও গোটাকত প্রশ্ন ছিল। যদি আপনি অনুমতি গ্যান তো জিজ্ঞেস করি।

কামিনী ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। করো, হাজার বার করো। ছেলে আমার হীরের টুকরো।

প্রণব ॥ সে তো অঙ্গার-জননীকে দেখেই টের পাচ্ছি।

কামিনী ॥ কি বোললে ?

প্রণব ॥ বোলছি, ছেলের নাম কি ?

কামিনী ॥ ওরে, বল না। লজ্জা কি।

যাদুগোপাল ॥ (অতি লজ্জিত) যাদুগোপাল।

প্রণব ॥ সুন্দর নাম। কি পাস ?

যাদু ॥ বি-এ।

প্রণব ॥ পাস না অনার্স ?

যাদু ॥ পাস।

প্রণব ॥ তাহলে তো সোপেনহাওয়ার অবধি যাওয়ার দরকার নেই, শোফারেই কাত হোয়ে যাবে।

কামিনী ॥ শোফার ! কি হবে ?

প্রণব ॥ যাদুগোপালবাবু, শোফার বানান করুন তো।

যাদু ॥ (তোতলাতে সুরু করে) এস-এস এস-এস—

কামিনী ॥ আমার ছেলে এখানে পরীক্ষা দিতে আসেনি।

প্রণব ॥ কক্ষণো না। আমাদের মেয়ে অবশ্য পরীক্ষা দিতে এসেছে।

নিভা ॥ ওসব এখন থাক, প্রণব।

প্রণব ॥ যাদুগোপাল বাবু, আপনি কি করেন ?

যাদু ॥ লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। শীগগিরই আপার ডিভিশন পাবো। বড় বাবু বোলেছেন।

প্রণব ॥ হ্যাঁ, ও রোজগারে অবশ্য হাতী পোষা যায়।

যাদু ॥ হাতী! হাতী পুষতে যাব কেন। আপনি যে কি বলেন!

প্রণব ॥ নাচ, ক্ল্যাসিকাল গান, সেতার, এস্রাজ, গীটার প্রত্যেকেই তো শুনেছি এক একটি হাতী। আপনাদের তো রীতিমত একটা হাতীশালা আছে। নাচ গান পোষা তো শুনেছি হাতী পোষারই সামিল।

কামিনী ॥ (পরিস্থিতিকে হালকা করবার অভিপ্রায়ে) নাচগান পোষা। হি হি তুমি অদ্ভুত কোরে কথা বল কিন্তু। নাচ গান কি কুকুর না বেড়াল যে পুষতে হবে?

প্রণব ॥ কুকুরও নয়, বেড়ালও নয়, কিন্তু কামড়ায়।

কামিনী ॥ কামড়ায়?

প্রণব ॥ হ্যাঁ, কামড়ায়। পকেটে।

নিভা ॥ প্রণব, ও সব কথা থাক। ওঁদের একটু মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা কোরতে হবে।

প্রণব ॥ আমাদের মুখ তো মিষ্টিই—ওঁরও, আমারও। হ্যাঁ, যাদুগোপালবাবুর বুকের ছাতি কত ইঞ্চি?

যাদু ॥ তিরিশ ইঞ্চি। ফোলালে সারে একত্রিশ।

প্রণব ॥ স্বাস্থ্যবান ছেলে।

যাদু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, অসুখ-বিসুখ পাবেন না।

প্রণব ॥ বাইসেপ্‌স্‌ কত ইঞ্চি?

যাদু ॥ বাইসেপ্‌স্‌। সে আবার কি!

প্রণব ॥ হাতের গুলো।

যাদু ॥ ও তাই বলুন। আপনি এমন ঘুরিয়ে কথা বলেন। কিন্তু ওটা তো জানি না ঠিক।

প্রণব ॥ ব্যায়াম কোরেছেন কোনদিন।

কামিনী ॥ না বাবা, ও সব গুণ্ডামিতে নেই আমার ছেলে।

প্রণব ॥ খুব ভাল ছেলে।

কামিনী ॥ খু-উ-ব।

প্রণব ॥ গুগ্‌লি বল কাকে বলে জানেন, যাদুগোপালবাবু?

কামিনী ॥ না। শামুক-গেঁড়ী-গুগলির খবর ও রাখে না।

প্রণব ॥ হ্যাঁ, দুনিয়ায় পুরুষের জ্ঞাতব্য অনেক কিছু জানে না দেখছি। যাদুগোপালবাবু, গলফের ষ্টিক কি কোরে ধরতে হয় বোলতে পারেন? সাঁতারে বাটারফ্লাই পদ্ধতি কাকে বলে? বিলিয়ার্ডের টেব্‌লের মাপ কত?

নিভা ॥ প্রণব!

প্রণব ॥ যাদুগোপালবাবু, আপনি গান গাইতে পারেন?

যাদু ॥ না। হেঁ-হেঁ কি যে বলেন আপনি।

প্রণব ॥ নাচতে জানেন?

যাদু ॥ হেঁ-হেঁ কি যে বলেন আপনি।

(হন্তদন্ত হোয়ে ঘরে ঢোকেন প্রিয়নাথবাবু ও তারকবাবু। খানিকবাদে চুপিসারে ঢোকে বিজন—পেছন দিকে দাঁড়িয়ে থাকে—কেউ বিশেষ টের পায় না।)

প্রিয়নাথ ॥ আসুন, আসুন। (হঠাৎ প্রণবের দিকে চোখ

পড়তেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন।) এই হতভাগা রাস্কেল, তোকে যে বাস-ষ্টপে থাকতে বোলেছিলাম।

প্রণব ॥ আজ্ঞে, আমি তো গিয়েছিলুম।

প্রিয় ॥ গিয়েছিলি ? তবে তারকবাবুকে আনিস নি কেন ?

প্রণব ॥ উনি তারকবাবু নাকি ? ওঁর সঙ্গে ওঁর স্ত্রী কোথায় ?

প্রিয় ॥ হতভাগা। ওঁর স্ত্রী সঙ্গে না থাকলে উনি আর তারকবাবু থাকবেন না, নাকি ? ওঁর স্ত্রীর অসুখ—আসতে পারেন নি।

প্রণব ॥ আমি তো ওঁকে চিনি না। সঙ্গে স্ত্রীও নেই—আপনি বলেছিলেন, স্ত্রী থাকবেন সঙ্গে, ছেলেও থাকতে পারে।

প্রিয় ॥ ছেলে সংকোচে আসেনি। (বিনোদবাবু ও কামিনী দেবীর দিকে চোখ পড়েছে।) এঁরা কারা ?

প্রণব ॥ আমি তো এঁদেরই তারকবাবু ভেবে—

প্রিয় ॥ অ্যাঁ, কি সর্বনাশ ! আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?

কামিনী ॥ বাগবাজার থেকে।

প্রিয় ॥ কি গেরো ? এ পাড়ায় কি কাজে এসেছিলেন ?

কামিনী ॥ মেয়ে দেখতে। তেরো নম্বর বাড়ীতে।

প্রিয় ॥ বাড়ুজ্যেদের বাড়ী ? হরনাথের মেয়ে নাকি ?

কামিনী ॥ হ্যাঁ, হরনাথ বাড়ুজ্যের মেয়ে।

প্রিয় ॥ ইস্। হরনাথ এখন কি ভাববে যে আমায় !

কামিনী ॥ সে আমরা না হয় তাঁকে বুঝিয়ে বলব যে ভুল হয়েছিল। তবে আপনার মেয়েকে আমাদের মোটামুটি পছন্দ হোয়েছে। আমরা কথাবার্ত্তা বোলতে চাই।



এ মিনসেটা ক্যা—হাড জ্বালাতে এল।

তারকবাবু ॥ (বাজখাঁই গলা-খাঁখারি দিয়ে ও বাঁশ ঠুকে) প্রিয়নাথবাবু, আমার সঙ্গে কথাটা শেষ কোরে ফেলুন।

কামিনী ॥ প্রিয়নাথবাবু, মেয়ে দেখে আমাদের পছন্দ হোয়েছে। আমার ছেলেও আপনার পছন্দ হবে না।

তারক ॥ প্রিয়নাথবাবু, আপনি ছেলে দেখে মোটামুটি রাজী হোয়েছিলেন, আমি মেয়ে দেখে কথাটা পাকা কোরতে চাই।

কামিনী ॥ প্রিয়নাথবাবু, এ মেয়ে আমার ঘরেরই বৌ হবে।

তারক ॥ প্রিয়নাথবাবু, আপনার মেয়ে আমার ছেলের কাছে বোলতে গেলে বাগদত্তা। (বীরত্ব প্রকাশের জন্য বাঁশের মত লাঠিটা ঠকঠক করেন।)

কামিনী ॥ (লাঠির তাড়নায় নিজেকে অপমানিত মনে কোরে ক্ষেপে যান) এ মিন্‌সেটা ক্যা—হাড় জ্বালাতে এল। দেবো মুখে নুড়ো জ্বেলে।

তারক ॥ (রেগে বাঁশটা জোরে ঠকঠক করেন) প্রিয়নাথবাবু, এ মাগীটা কে—কোন চুলো থেকে এলো? বাড়ী থেকে ঘাড় ধোরে দূর কোরে দিন।

কামিনী ॥ তবে র‍্যা। (কোমরে আঁচল আঁটতে থাকেন) এ মেয়ে কে নেয় দেখি। কার ঘাড়ে কটা মাথা !

তারক ॥ এ মেয়ে আমার ছেলের বৌ। আমি তারক দারোগা, হ্যাঁ। (প্রিয়নাথবাবু অসহায়ভাবে একবার কামিনী দেবীকে ও একবার তারকবাবুকে নিরস্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকেন।

অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করে ধীরেশ। কোন ব্যস্ততা নেই। ধীর ব্যবহার—মঞ্চের এই মুহূর্তের আবহাওয়ার ঠিক বিপরীত। চলন-বলন অত্যন্ত স্মার্ট।)

ধীরেশ॥ (আঙ্গুল দিয়ে নীতাকে দেখিয়ে কামিনী দেবী ও তারকবাবুকে) এটা কি একটা রুইমাছ?

(অপরিচিত লোকটির প্রশ্নের আকস্মিকতায় ও তার চমকপ্রদ নূতনত্বে সবাই মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে যায়।)

ধীরেশ॥ এটা কি একটা রুই মাছ?

তারক॥ মানে?

ধীরেশ॥ এটাকে মধ্যেখানে ফেলে যেমন দরদাম কোরছেন দুজনে, তাতে মনে হোচ্ছে, এটা একটা মানুষ নয়, একটা রুই মাছ। মনে হচ্ছে, আপনাদের ইচ্ছেটাই সব—এদিকের ইচ্ছে বোলে কোন পদার্থ থাকতে নেই।

প্রিয়॥ (এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পান, বিমূঢ়ভাব কেটে যায় এবং ক্রুদ্ধ হোয়ে ওঠেন) প্রণব, এই ছোঁড়াটা আবার এর মধ্যে কেন? এদের দুজনকে সামলাতেই আমার······ ও নিভা, আমার বুকটা ধড়ফড় কোরছে, ধর আমায়।

বিজন॥ (এতক্ষণে কথা বলে। এগিয়ে আসে।) নিভা, তুমি ওঁকে নিয়ে ভেতরে যাও, এদিকে দেখছি আমি আর প্রণব।

নিভা॥ চল বাবা। তোমার ব্লাডপ্রেসারটা আবার বেড়ে গেল বোধ হয়।

প্রিয় ॥ আর না বেড়ে উপায় আছে! কিন্তু এদিকে এইসব জট পাকিয়ে গেছে যে।

নিভা ॥ উনি আর প্রণব দেখবেন। তুমি ভেতরে চল।

প্রিয় ॥ না, প্রণবকে দিয়ে কিছু হবে না, ওটা একটা বাঁদর। বিজন, বাবা তুমি ব্যাপারটার একটা মিটমাট কর। বড় অসুস্থ আমি। নমস্কার, নমস্কার।

বিজন ॥ ঠিক আছে, আমি দেখছি। (প্রিয়নাথ ও নিভার প্রস্থান।)

ধীরেশ ॥ হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। মেয়েটি সাবালিকা, শিক্ষিতা, তার নিজস্ব একটা মতামত আছে। সভ্য সমাজ সে মতের মূল্য দেয়। আপনারা সভ্য সমাজের লোক বলেই আশা করি। এই মেয়েটি একটি ছেলেকে ভালবাসে এবং তাকেই বিবাহ কোরতে চায়। আনন্দের সঙ্গে বোলছি, সে ছেলেটি আর কেউ নয়, স্বয়ং আমি। আশা করি, আপনারা আপনাদের কর্তব্য এখন বুঝতে পারছেন। (অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করে।)

তারক ॥ কি, এতবড় আস্পর্ধা। বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান। আমিও তারক দারোগা—শোধ নেব আমি এর।

কামিনী ॥ আমি এ হেনস্থা সহ্য করবার মেয়ে নই। আমিও দেখে নেব।

ধীরেশ ॥ (কামিনীদেবীর সামনে এগিয়ে এসে) দেখে নিন। নিয়েছেন? (দুজনকে লক্ষ্য কোরে) আচ্ছা মশাইরা

—(কামিনী দেবীকে) ও, আপনি তো—তা আপনাকেও মশাই বলা যেতে পারে। আপনারা দুজনেই সোজা পূবমুখে একটু তাকান। চার গজ দূরে সাত ফুট বাই সাড়ে তিন ফুট একটি দরজা দেখা যাচ্ছে। আশা করি দেখতে পাচ্ছেন দুজনেই। (হঠাৎ বিনোদবাবুকে) ও, আপনিও বুঝি আছেন আপনার স্ত্রীর অন্তরালে। আচ্ছা আড়াইজনেই আশা করি দরজাটা দেখতে পাচ্ছেন।

বিনোদ ॥ (কামিনী-তারক-সংবাদের সময় থেকেই স্ত্রীর আঁচল ধোরে কম্পমান) চল গো পালাই। আমার ভয় কোরছে।

যাদু ॥ (বিনোদের সার্ট ধোরে কাঁদ কাঁদ সুরে) আমারও বড় ভয় কোরছে।

তারক ॥ এত বড় অপমান। চললুম, এখুনি মানহানির মামলা দায়ের কোরব।

কামিনী ॥ চলুন তারকবাবু, আমরা দুজনে ঐক্যবদ্ধ হব।

তারক ॥ হ্যাঁ, চলুন, ঐক্যবদ্ধভাবেই এ অপমানের প্রতিকার কোরতে হবে।

(দুজনে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রস্থানোদ্যত। পেছনে অঞ্চলাশ্রিত ভীত ছাগ শিশুর মত লাফাতে লাফাতে চলেন বিনোদবাবু। তাঁর সার্ট ধোরে চোখ মুছতে মুছতে চলে যাদুগোপাল। এদের প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঢোকে বিপনে ময়রা—হাতে মিষ্টির চাঙ্গাড়ি।)

ধীরেশ ॥ একটু মিষ্টিমুখ কোরে যেতে পারেন অবশ্য। এটা আপনাদের জন্যেই আনা হোয়েছিল।

তারক ও কামিনী ॥ হুঃ। (চারজনের প্রস্থান। চাঙ্গাড়ি রেখে বিপিনেরও প্রস্থান।)

বিজন ॥ ব্র্যাভো, ইয়াংম্যান। নারীপ্রেমে শক্তিমান যুবক, এবার তুমি কোন ভেলকি দেখাবে? আমাদের কি অন্য কোন দরজা দেখাবে? কিন্তু তার আগে আমি বিচার কোরব। তোমরা শুনেছ, এখন আমিই প্রিয়নাথবাবুর প্রতিনিধি। প্রণব, এ যুবক যা বোলল, তা সত্য?

প্রণব ॥ (নাটকীয়ভাবে মাথা নুইয়ে) হ্যাঁ, জাহাঁপনা, সবই সত্য। (প্রস্থান)।

বিজন ॥ বালিকা, এ যুবকের উক্তি সত্য যে তুমি এর প্রতি প্রণয়াসক্ত?

নীতা ॥ যাঃ, অসভ্য। (ভেতরে চলে যাবার চেষ্টা করে। বিজন তার হাতটা ধরে।)

বিজন ॥ না বৎস, শাস্তি না নিয়ে বিজনকুমারের হাত থেকে রেহাই নেই। (ধীরেশকে) শোন আমার বিচার। জোর কোরে এই বালিকার হাতটি ধর।

ধীরেশ ॥ হাত ধোরব? অর্থাৎ পাণি গ্রহণ কারতে বোলছেন?

বিজন ॥ ধীরে, বন্ধু ধীরে। অতটা কোরতে হবে না। এখনই। শুধু হাত ধরলেই চলবে।

ধীরেশ ॥ যথা আজ্ঞা। (হাত ধরে)

বিজন ॥ এইবার ঐ চাঙ্গাড়ি থেকে রসগোল্লা নিয়ে বালিকার মুখ



যেন তোমায় নিমের জল খাওয়াচ্ছি

মিষ্টি করাও। ও অনেকক্ষণ ধোরে তিক্তমুখে এখানে বসে আছে। আচ্ছা চলি, এসে যেন তোমাদের দুজনেরই মিষ্টি মুখ দেখতে পাই। তোমাদের হৃদয়ের অবস্থা এখন আশা করি ভাল; দেখে আসি, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হৃদয়ের অবস্থাটা এখন কেমন। (প্রস্থান)

ধীরেশ ॥ (রসগোল্লা নিয়ে সাধাসাধি করে) বিচার শুনলে তো। আদেশ অমান্য কোরো না, শীগগির খেয়ে নাও। খাও না। আরে, কি হ'ল। রসগোল্লা বৈ তো নয়। যেন তোমায় নিমের জল খাওয়াচ্ছি। নাও, নাও।

(নীতা মুখ ঘুরিয়ে নেয় ও ধীরেশ সাধতে থাকে। হঠাৎ নীতা ঘুরে রসগোল্লাটা ধীরেশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারে।)

নীতা ॥ তুমি খাও।

(ধীরেশের বিহ্বলতার সুযোগে নীতা হাত ছিনিয়ে নিয়ে চোলে যায়। ধীরেশের রসাক্ত মুখের ওপরে নামে যবনিকা।)

"দাও ফিরে সে অরণ্য"



[মঞ্চ অন্ধকার থেকে ক্রমে আলোকিত হ'ল। দেখা গেল রাজা বসে আছেন। কোমরে চওড়া কোমরবন্ধ, পায়ে নাগরা জুতো—তার ডগাগুলো সুউচ্চ বক্রতায় প্রায় জানু-স্পর্শী, মাথায় 'গাধার টুপি'র রাজ সংস্করণ।

রাজার চিন্তিত মুখ। মন্ত্রীর প্রবেশ--তার হাতে একটি থালা। থালায় কলা, ফল-মূল ও সন্দেশ। থালাটি মন্ত্রী রাজার সামনে ধরলেন]

রাজা ॥ এ সব কি ?

মন্ত্রী ॥ আজ্ঞে, আমার বাগানে ফলেছিল।

রা ॥ (কলা খেয়ে) বাঃ! অতি সুস্বাদু! এ কলা তোমার বাগানের ?

ম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

রা ॥ (একটি সন্দেশ খেয়ে) আর এই সন্দেশ ?

ম ॥ আজ্ঞে সন্দেশও আমার বাগানের।

রা ॥ (সন্দেশে পরিতৃপ্ত) বাঃ, চমৎকার! (অকস্মাৎ)—কিন্তু মন্ত্রী আমি চিন্তিত।

ম ॥ আজ্ঞে ? (নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে)

রা ॥ আমি চিন্তিত।

ম ॥ তাহলে রাজবৈদ্যকে ডাকি। এ ব্যাধি তো আপনার পূর্ব্বে ছিল না।

রা ॥ না কাউকে ডাকতে হবে না। আমি তোমাকেই ডেকেছি।

ম ॥ আজ্ঞা করুন। আমি বরং আমার মাথায় আপনার চিন্তার ভার বহন করি। আপনার মাথা তো চিন্তা করবার জন্য নয়, শুধু মাত্র রাজমুকুট ধারণ করবার জন্যে।

রা ॥ সে কথা অত্যন্ত সত্য। কিন্তু—

ম ॥ আর কিন্তু কিন্তু করবেন না মহারাজ। আপনার চিন্তার কথা শুনে অবধি আমার ঘুম হচ্ছে না।

রা ॥ অস্থির হয়োনা মন্ত্রী। তোমাকে অস্থির দেখলে আমিও কেমন অস্থির হয়ে পড়ি।

ম ॥ কিন্তু মহারাজ আপনি অস্থির হলে আমি যে সরকারীভাবে অস্থির হয়ে পড়ি। বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন।

রা ॥ (চিন্তিতভাবে) প্রজারা সব দেশের অতীত ঐতিহ্যের কথা ভুলে যাচ্ছে। দিন দিন তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। তাদের আমি দেশের পুরাতন ঐতিহ্যে পুনঃ—প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই।

ম ॥ নিশ্চয়ই, একশো বার, হাজার বার, লক্ষবার।

রা ॥ মুনি-ঋষিদের—তথা প্রাচীন সভ্যতাকে কি আমরা ভুলে যাবো?

ম ॥ না, কখনো না।

রা ॥ সেই সব প্রাতঃস্মরণীয়দের অমর বাণী আমরা ভুলে যাবো?

ম ॥ কী সর্বনাশ! তা কখনো ভুলতে পারি?

রা ॥ তুমি না ভুলতে পারো, লোকে ভুলে যাচ্ছে যে।

ম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যাচ্ছে।

রা ॥ (হুংকার দিয়ে) ভুলতে দেব না আমি। কোন্ লোকে ভুলছে এ সব? নিয়ে এস তার গর্দান।—

ম ॥ আজ্ঞে হুজুর, তাহলে সারাটা দেশেরই গর্দান নিয়ে টানাটানি।

রা ॥ হুঁ, অবস্থা তো তাহলে বড় খারাপ। কিন্তু মন্ত্রী আমার রাজ্যে তো এ চলবে না। আমি আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সারা দেশের শুধু মনে নয়—জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

ম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, এতো আপনারই উপযুক্ত কথা।

রা ॥ কিন্তু উপায়টা কি মন্ত্রী? কী করা যায়? আচ্ছা দেখো, আমাদের ওই মুনি-ঋষিরা কি বলেছেন বলতো—তারপর ভেবে দেখি।

[মন্ত্রী মাথা চুলকোতে লাগল]

রা ॥ মাথা চুলকোতে শুরু করলে কেন?

ম ॥ আজ্ঞে না এই—ইয়ে—মাথায় একটু হাত দিয়েছি।

রা ॥ তা মাথায় হাত দিয়েই বা বসে পড়লে কেন?

ম ॥ আজ্ঞে ভাবছি।

রা ॥ কী ভাবছো? কিছু পড়াশোনা নেই বুঝি ওঁদের সম্বন্ধে?

ম ॥ আজ্ঞে না, তা নয়, ওদের সম্বন্ধে আপাদমস্তক পড়েছি।

রা ॥ তবে কি ভাবছো?

ম ॥ আজ্ঞে ভাবছি কিনা—ইয়ে—কোনখান থেকে শুরু করি। ওঁরা যা বলে গেছেন তা কাগজের খাঁচায় পুরলে প্রায় সাড়ে তিপ্পান্ন রিম্-এর ধাক্কা।

রা ॥ কী সর্বনাশ! এত শুনতে গেলে যে তিনবার জন্মানো দরকার।

ম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনতে হলে তিনবার, বুঝতে গেলে তিন শ'বার।

রা ॥ তবে কি করা যায়? (চিন্তিত)

ম ॥ আপনি কিছু ভাববেন না, হুজুর। ছাত্রদের তিন মন বইএর তিন-সেরী 'made easy' আছে, কবরেজ তার একটা বড়ীর মধ্যে সর্বশক্তি-সার-নির্যাস পুরে দেয় আর আমরা পারব না?

রা ॥ ধন্য ধন্য মন্ত্রী। অপূর্ব তোমার বুদ্ধি। তোমার রাজা হয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আজ তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়ল।

ম ॥ মহারাজ দয়ার অবতার।

রা ॥ মন্ত্রী, তুমি সাড়ে তিপ্পান্ন রিমকে সাড়ে তিন লাইনে এনে মোদ্দা কথাটা শোনাও তো।

ম ॥ (একটু ভেবে) প্রাচীন মুনি ঋষিরা বাস করতেন তপোবনে —অর্থাৎ অরণ্যে। ওঁদের আদর্শ ছিল অরণ্য-জীবন। সেই অরণ্য-জীবনের আদর্শ আমাদেরও প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রা ॥ উত্তম। শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে এসো।

ম ॥ [শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে এলো) বলুন, আমি এখুনি নোট করে নিচ্ছি। একটু আস্তে আস্তে বলবেন হুজুর।

রা ॥ সারা দেশে এই বলে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিতে হবে—আচ্ছা লেখো···সারা দেশে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিতে হবে। কি লেখা যায়? একটু ধরিয়ে দাও তো।

ম ॥ আচ্ছা এই রকম লিখলে হয় না ?—হে দেশবাসীগণ, তোমরা অরণ্য-জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করো। অরণ্য জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন হলো অরণ্য।

রা ॥ (ধমক দিয়ে) চুপ করো। লেখ, তাড়াতাড়ি লিখে যাও। (ধীরে ধীরে) কিন্তু মানুষের বসতির চাপে অরণ্য আজ শীর্ণ। কি, হাঁ করে তাকাচ্ছ কেন ? বানান তো ? দন্ত্যস-এ হ্রস্বই দন্ত্যনয়যফলা। শুক্লা চতুর্দশী খুব ভাল দিন। ঐ দিন সারা দেশে শুভ বন-মহোৎসব। পূর্ণোদ্যমে ঐ দিন দেশে বৃক্ষ রোপণ শুরু হোক।

ম ॥ কী আপনার ভাষাজ্ঞান! কী অদ্ভুত আপনার কথা-সাজানোর দক্ষতা।

রা ॥ (প্রথমে মোহিত, পরে অকস্মাৎ) তুমি কি আমাকে চাটুবাক্যে তুষ্ট করতে চাইছ ?

ম ॥ মহারাজ, চাটুবাক্য যে আপনার বুদ্ধির কাছে ধরা পড়ে যাবে। তা' ছাড়া চাটুবাক্য যত বড় করে বলি না কেন, আপনি যে তার চেয়েও বড়।

রা ॥ (গম্ভীর) হ্যাঁ, সে কথা মনে থাকে যেন। আর একটা জিনিস, খুব বড়ো বড়ো প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করতে হবে।

ম ॥ যে আজ্ঞে।

রা ॥ এই বৃক্ষ রোপনের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা যাক (হিসেব করে) তেত্রিশ কোটি সাত লক্ষ চোদ্দ হাজার তিনশো সাতান্ন টাকা। কুলোবে তো।

ম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, সই করুন। হুজুর এবার তাহলে দশ মিনিটের ছুটি মঞ্জুর করুন।

রা ॥ দশ মিনিট? (বিশেষ চিন্তা করে) সাত মিনিটের জন্যে ছুটি দিতে পারি।

[মন্ত্রীর প্রস্থান

মঞ্চ ক্রমে অন্ধকার হয়ে যায়]

॥ ২য় দৃশ্য ॥

(রাজা একাকী চেয়ারের উপর অলসভাবে বসে আছেন। নেপথ্যে পাশ্চাত্য যন্ত্রসঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে)

ম ॥ (হন্তদন্ত হয়ে) সর্বনাশ, হুজুর!

রা ॥ কেন কি হলো? যতো সব ঝামেলা!

ম ॥ শ্বেতদ্বীপ, পীতদ্বীপ থেকে যে এত দামী দামী গাছ আনা হোল, গরু-ছাগলে সব সাপ্‌টে-সুপটে নিয়ে গেছে।

রা ॥ হুঁ—গরু-ছাগলেও আমাকে মানে না। এত আস্পর্ধা! মেরে ফেল—বিলকুল সব মেরে ফেল। একটাও আস্ত রাখবে না।

ম ॥ আজ্ঞে, মুনি ঋষিরা গরু মারতে বারণ করেছেন যে।

রা ॥ তাই নাকি? কিন্তু এ কী রকমের উল্টো-উল্টো কথা। গাছ বাঁচাতে হবে, অথচ গরু মারা পাপ।

ম ॥ (কাঁচু মাচু হ'য়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, এ একটা ভুল ওরা করে গিয়েছিলেন বটে। হুজুরের বুদ্ধিতে তো কিছুই অগোচর থাকবার যো নেই···তা হুজুর আপনিই বলুন—এ অবস্থায় কি করা যায়।

রা ॥ তাই তো ভাবছি।

ম ॥ (ভাবিয়া) একটা উপায় আছে হুজুর !

রা ॥ কী উপায় ?

ম ॥ কাঁটাতার।

রা ॥ কাঁটাতার ! কাঁটাতার দিয়ে কি হবে ?

ম ॥ আজ্ঞে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

রা ॥ অপূর্ব—অপূর্ব তোমার মেধা।

ম ॥ (আঙ্গুল নেড়ে হিসেব করে) চুয়াল্লিশ কোটি সাড়ে তিনলক্ষ টাকা লাগবে কাঁটাতার বাবদ।

রা ॥ যাও শ্লেট পেন্সিল আনো, সই করে দিই।

(মন্ত্রীর প্রস্থান। রাজার হিসাব ও পায়চারি—পরে উপবেশন)

ম ॥ (বিরসমুখে কিছুক্ষণ পরে শ্লেট-পেন্সিল ফাইল-হাতে প্রবেশ) হুজুর ! আবার বিপদ !

রা ॥ কেন ? কী হল ? আমায় কি একটু ঘুমুবারও সময় দেবে না তোমরা ?

ম ॥ আজ্ঞে এক্ষুনি দপ্তরে খবর এসেছে তিন-চতুর্থাংশ গাছ মরে গেছে।

রা ॥ কেন, কেন ? কী করে মরল ?

ম ॥ আজ্ঞে না খেতে পেয়ে। গাছের জন্যে সারের ব্যবস্থা ছিলনা, জলও তেমন পায়নি।

রা ॥ (রেগে উঠে) অপদার্থ সব !

ম ॥ কিন্তু একটা জ্ঞান হয়ে গেল, হুজুর !

রা ॥ কী জ্ঞান ?

ম ॥ না খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে, কিন্তু গাছ বাঁচেনা। এই দেখুন না—আমাদের রাজ্যে তো বেশীর ভাগ লোকই খেতে পায়না, কিন্তু ধুক্‌ধুক্ ধুক্‌ধুক্ করে ঠিক বেঁচে আছে। আর দেখুন গাছগুলোর কাণ্ড; দুদিনেই—[মন্ত্রী রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিলেন] পরলোকগমন !

রা ॥ তা আর কেঁদে কি করবে, মন্ত্রী ! বুঝতে পারছি—মানুষ আর গাছের পার্থক্য গোড়ায় ঠিকমতো ধরতে পারিনি। তাতে তোমার অপরাধ নেই। এতদিন তোমার কারবার ছিল মানুষ নিয়ে—মানুষের সব কিছু তোমার নখদর্পণে। গাছ নিয়ে কারবার সবে সুরু—একটু আধটু ভুল ত্রুটি তো হবেই। তুমি দুঃখ কোরোনা মন্ত্রী ! আদর্শের পথে সহস্র বিঘ্ন। একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা কি চাট্টিখানি কথা ?

ম ॥ হুজুর, এক চতুর্থাংশের কি হবে ?

রা ॥ যাও, সারের জন্য ৪৬ কোটি পৌনে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলো।…এক চতুর্থাংশকে বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। আদর্শের পথে সহস্র বিঘ্ন।…মন্ত্রী, যাওয়ার সময় বেতারটা খুলে দিও তো। (মন্ত্রী রেডিয়োর চাবি খুললেন, খবর ঘোষণা সুরু হলো)

বেতার-ঘোষণা ॥ "আজকের বিশেষ খবর হলো, রাজ্যের কয়েক স্থানে ভীষণ খাদ্যের ঘাটতি পড়েছে। দেশ আজ এক নূতন বিপদের সম্মুখীন। বাইশ পরগণা, মর্তমান ইত্যাদি জেলায় নিদারুণ খাদ্যাভাবে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা অসংখ্য। এক

বেসরকারী খবরে প্রকাশ দেশের এই দুর্দশার সুযোগে দেশ-দ্রোহীদের উস্কানীতে অবনীপুর জেলার নিরন্ন চাষীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা মিছিল করে পায়ে হেঁটে রাজার সঙ্গে দেখা করবে।"

[খবর শুনতে পেয়ে মন্ত্রী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন]

রা ॥ [রেগে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে]

চাবকে লাল করে দাও এই সব অতীত ঐতিহ্যে নিষ্ঠাহীন উচ্ছৃঙ্খল অর্বাচীনদের। কী, হাঁ করে দেখছ কি মন্ত্রী? যত রকমের অগ্নি-অস্ত্র আছে সব নিয়ে এস। নিশ্চিহ্ন করে দাও এইসব মূর্খদের।

ম ॥ এই অবস্থায় আপনার বিচলিত হলে কি চলে? আপনি একটু সুস্থির হোন্। সব ব্যবস্থা আমি পাকা করে দিচ্ছি। এক্ষুণি শহরের চারপাশে আমি সশস্ত্র প্রহরীর দৃঢ় অবরোধের ব্যবস্থা করছি। দেখি, এই লৌহ যবনিকা ভেদ করে কে আসে আমাদের রাজাধিরাজের কাছে?

রা ॥ (চেঁচিয়ে) যাও, মন্ত্রী, অতীত ভারতের ঐতিহ্যে আস্থাহীন এইসব বর্বরগুলোকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দাও।

ম ॥ আমি সেই ব্যবস্থা করে আসছি, আপনি কিছু ভাববেন না। কিন্তু শিক্ষিত লোকদের শিক্ষাটা একটু অন্যরকম হ'লে ভাল হয়, হুজুর।

রা ॥ তাই তো। কি করা যায়!

ম ॥ এক কাজ করা যাক্। অর্থনীতিবিদ্‌দের দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে

দেওয়া যাক বর্তমানে গাছের উপকারিতা কতখানি, মানুষের খাদ্যের চেয়ে গাছের খাদ্যের দরকার কত বেশী।

রা॥ (হাস্যমুখে) উত্তম প্রস্তাব। অধ্যাপক খোশনাবীশকে ডেকে বলে দাও, তারা যেন বেতারে-কাগজে বক্তৃতা কোরে গাছের উপকারিতার কথা ঘোষণা করে। যাও মন্ত্রী, শীগগীর যাও।

[মন্ত্রী প্রস্থানোদ্যত]

রা॥ শোন বেতারটা চালিয়ে দিয়ে যাও।

[মন্ত্রী বেতার চালিয়ে প্রস্থান করলো]

[বেতারে যন্ত্র সংগীত কিছুক্ষণের জন্য। তারপর রেডিয়োর ঘোষণা! "এতক্ষণ শ্বেতদ্বীপের সমবেত যন্ত্র-সংগীত শোনানো হলো, এখন 'দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অরণ্যের ভূমিকা' এই বিষয়ে বলছেন অধ্যাপক খোশনাবীশ!"]

বেতার-বক্তৃতা॥ 'আমাদের বর্তমান জীবনের দুঃখদুর্দশার মূলে কি? গাছকে আমরা ভুলে গেছি। গাছের কথা ভেবে দেখুন একবার; কতদিক্ দিয়ে গাছ আমাদের উপকার করতে পারে। প্রথমে ধরুন, কাণ্ড, শাখা ইত্যাদি। এদের কাঠ দিয়ে কি না হয়—আপনার পেন্সিল থেকে জাহাজ পর্যন্ত। এমনকি অন্তিম সৎকারেও এর প্রয়োজনীয়তা প্রচুর। তারপর ধরুন ফল; খাদ্য সমস্যার সমাধানে এর ভূমিকা বৃহত্তম। এতো আপনারা সকলেই জানেন······পাতার কথাও আমরা ভুলতে পারিনা।

পাতা সারাদিন ধরে অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে, এটা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। পাতা খেয়েই গরু ছাগল সব বাঁচে। এই গরুই আমাদের চাষের প্রধান অবলম্বন। গরুর দুধে নানাপ্রকার খাবার তৈরী হয়, অতএব এক কথায় বলা যেতে পারে; পাতাই হচ্ছে খাদ্য-সমস্যার একমাত্র সমাধান। গাছের ছায়া, গাছের ফুলের কথা ভুললেও চলবে না……'

[হাস্যমুখে মন্ত্রীর প্রবেশ]

রা॥ কি মন্ত্রী, কি সংবাদ? তুমি তো সব সময়েই দুঃসংবাদই বয়ে আনো।

ম॥ [একগাল হেসে) আজ্ঞে না মহারাজ, আজ একটা সু-সংবাদ আছে।

রা॥ কী, কী খবর?

ম॥ একটা গাছে একটা ফল ধরেছে।

রা॥ এ্যাঁ, ফল ধরেছে?

ম॥ হ্যাঁ, মহারাজ, ফল ধরেছে।

রা॥ আহা, আজ একটা শুভদিন! যাও মন্ত্রী শীগ্‌গির সারা দেশে এই ফলটা ঘুরিয়ে নিয়ে এস।

ম॥ (মাথা চুলকে) কিন্তু ফলটা ফলেছিল দুদিন আগে। পচে-গলে এখন একেবারে এক্‌সা হয়ে গেছে।

রা॥ কুছ্ পরোয়া নেই, আঁটিই ঘুরিয়ে নিয়ে এস। দেশের সর্বত্র ঘুরবে। হোক একটু খরচা। তোমার যা ইচ্ছে টাকা খরচ করো এই ভ্রমণ বাবদ। সোনার বাক্সে মখমলের

আসনে বসিয়ে এই সবেধন নীলমণিকে ঘুরিয়ে আনো, দেশবাসী দেখুক।

ম ॥ আজ্ঞে, এখুনি নিয়ে আসছি।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

রা ॥ যাক, এতদিনে আমার জীবন সফল। (খুশিভাবে পায়চারি। মন্ত্রীর প্রবেশ। হাতে ছোট একটি সিংহাসন—তার মখমলের আস্তরণের ওপর আঁটি উপবিষ্ট)

ম ॥ মহারাজ, হবে এতে ?

রা ॥ চমৎকার ! দেশের সর্বত্র আমাদের স-ফলতা প্রচার কর। যাও।

ম ॥ হুজুর আপনার দয়ার সীমা নেই। আপনি দেশমাতার একমাত্র সুযোগ্য সন্তান। আপনার শতবর্ষ আয়ু কামনা করি। (শ্লেট এনে) তের লক্ষ চৌত্রিশ হাজার—এতেই আঁটির ভ্রমণ-ব্যয় কুলিয়ে যাবে। হুজুর সই করুন। (রাজা সই করলেন। মন্ত্রীর শ্লেট ও আঁটি-সহ প্রস্থান ও একটুবাদে একক প্রবেশ)

ম ॥ হুজুর এই এত সব কাজের মধ্য দিয়ে এক পরম সত্য আবিষ্কার করেছি।

রা ॥ কী সে সত্য ?

ম ॥ সে সত্যটা এই যে মানুষ না খেয়ে বেশ কিছুদিন বাঁচতে পারে, কিন্তু চিরকাল বাঁচতে পারেনা। আমাদের রাজ্যের অগণিত লোক কাতারে কাতারে মারা যাচ্ছে। (বাইরে কোলাহল)



তেরো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা—আঁটির ভ্রমণ ব্যয়

রা ॥ (ভীত হয়ে) এই সেরেছে ! এতে গণ্ডগোল বেড়ে যাবে যে। আমাদের কি সুবিধা হবে এতে ?

ম ॥ [উৎফুল্ল হ'য়ে] অনেক সুবিধা হবে। অনেক সুবিধে। লোকালয় থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে—আর সেই জায়গায় এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে অরণ্য। এ রাজ্যে অরণ্য প্রতিষ্ঠার আর কোন বাধা নেই। কোন বাধা নেই, হুজুর।

রা ॥ কথাটা তো ঠিকই ! সত্যি আর কোন বাধা নেই। লোক মরলেই গাছ জন্মাবে। মন্ত্রী, আমার আনন্দে চার পা তুলে নাচতে ইচ্ছে করছে।

ম ॥ আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

রা ॥ আমার কবিতা আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছে। [আবৃত্তির ঢংয়ে] 'দাও ফিরে সে অরণ্য……লহ এ নগর'……

ম ॥ হুজুর ঐ কবিতা আবৃত্তি করে ওর রচয়িতা রবীন্দ্রনাথকে আর বেশী মাথায় তুলবেন না।

রা ॥ কেন, কেন ?

ম ॥ রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাল লোক নন। উনি আমাদেরও খুব গালমন্দ করেছেন।

রা ॥ নিয়ে এস রবীন্দ্রনাথের গর্দান।

ম ॥ হুজুর আপনার ভয়ে সে কাপুরুষ আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছে।

রা ॥ [বীরদর্পে] ব্যাটা খুব বেঁচে গেল।

[বাইরে কোলাহল ও যন্ত্রঝংকার আগে থাকতেই বাজতে

সুরু করেছে। প্রথমে ক্ষীণ, তারপর চড়া। এই সময় চরম পর্যায়ে আসে। রাজা বীরদর্পে সঙ্কুচিত হয়ে আসেন]

রা ॥ মন্ত্রী, ও কী ?

ম ॥ আমি দেখছি মহারাজ, আপনি ভয় পাবেন না।

[প্রস্থান]

রা ॥ [রাজা প্রবল বেগে কম্পমান] কী, আমি ভয় পেয়েছি ? না-না কক্ষনোই না।

ম ॥ [দ্রুত প্রবেশ করে] সর্বনাশ মহারাজ, রাজ্যের সকল প্রজা খাদ্যাভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে আপনার সংগে দেখা করতে এসেছে।

রা ॥ [প্রায় কেঁদে] মন্ত্রী, কী হবে ?

ম ॥ আপনি কিছু ভাববেন না। আমি এখনই আগ্নেয় ওষুধ দিতে বলে আসি। (প্রস্থান)

[রাজা কাঁপতে থাকে। নেপথ্যে কোলাহল-ঝংকার দূরে সরে যায়, ক্রমে থেমে যায়। মন্ত্রীর প্রবেশ।]

ম ॥ সব ব্যবস্থা করে এসেছি, মহারাজ।

রা ॥ (আকস্মিক রাজকীয় দর্পে) অতি উত্তম। তুমি কৃতী রাজকর্মচারী।

ম ॥ আর একটা কাজ কিন্তু করা দরকার।

রা ॥ কি কাজ ?

ম ॥ বন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা প্রাণদান করল তাঁদের জন্যে একটা শহীদস্তম্ভ তৈরী করতে হবে।

রা ॥ (আনন্দোৎফুল্ল) মন্ত্রী, বেশ বলেছো! তোমার এবার পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়ল।

ম ॥ মহারাজের জয় হোক্। কিন্তু মহারাজ, তাহলে শহীদ স্তম্ভের সামনে আপনি যে বক্তৃতাটি দেবেন, সেটা একটু অভ্যাস করে নিন।

রা ॥ অভ্যাস!

ম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, যাকে মুনিঋষিরা বলে গেছেন 'অনুশীলন'।

রা ॥ অনুশীলন ?

ম ॥ আজ্ঞে, শ্বেতদ্বীপে যাকে বলা হয় 'রিহার্সাল।'

রা ॥ ও রিহার্সাল! তাই বল।…আচ্ছা আমি ব'লতে সুরু করি।

ম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে তার আগে আপনার পাদুকা দুটি খুলে খালি পায়ে দাঁড়ান শহীদদের সম্মানার্থে।

রা ॥ আবার জুতোও খুলতে হবে ? (অনিচ্ছুকভাবে) নাও।

ম ॥ এবার বলুন।

রা ॥ (বলার চেষ্টায় ঘর্মাক্ত হলেন) দেখ মন্ত্রী, ঠিক আসছে না। একটা শহীদবেদী সামনে থাকলে বেশ আবেগ আসত।

[উভয়েই এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলেন]

ম ॥ তেমন একটা কিছুই দেখছি না তো।

রা ॥ (পাশে খুলে রাখা জুতো জোড়া দেখিয়ে) এটাকে করলে কেমন হয় ?

ম ॥ আজ্ঞে খুব ভালো হয়। [মন্ত্রী ওটা ঠিকমত বসিয়ে জুতোর ওপর নিজের রুমালটি বিছিয়ে দিলেন]



আমি আর বলতে পারছি না, কান্না পেয়ে যাচ্ছে

রা ॥ চমৎকার শহীদ বেদী হয়েছে! এবার আমি কিন্তু বলছি।

ম ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ [নিজের জুতো তাড়াতাড়ি খুলে খুব গম্ভীর মুখে দাঁড়াল]

রা ॥ অরণ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে, যারা—যারা—অ্যাঁ, কিরকম হচ্ছে মন্ত্রী?

ম ॥ আজ্ঞে, অভূতপূর্ব।

রা ॥ যারা—যে লোকগুলো—

ম ॥ বলুন,—যে অমর বীরবৃন্দ—

রা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, অরণ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে যে অমর বীরবৃন্দ তাদের অমূল্য জীবন দান করেছে, তাদের জন্যে আমার চোখে জল ভরে আসছে, তাদের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাদের আদর্শ সব দেশবাসীর আদরের বস্তু। আমি আর বেশী বলতে পারছি না, আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি—আমি কাউকে ভুলি না, আমি অকৃতজ্ঞ নই।

ম ॥ মহারাজের জয় হোক্! [মঞ্চ অন্ধকার হতে লাগল। সমবেত কণ্ঠের জয়ধ্বনি শোনা গেল—মহারাজের জয় হোক্।—জয়, মহারাজের জয়!]

যবনিকা

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে



[উচ্চবিত্তের বৈঠকখানা—উপযুক্ত সোফা ইত্যাদিতে শোভিত। মলিনা, প্রৌঢ়া, লেস বুনছেন। প্রবেশ করে সুবাস। তার পরিচ্ছদে ধনের ঘোষণা এবং চলনে বলনে কৈবল্য।]

মলিনা ॥ এসো, সুবাস এসো। অনেকদিন আমাদের বাড়ীতে আসনি।

সুবাস ॥ হ্যাঁ, হয়ে ওঠেনি।

মলিনা ॥ কেন বাবা, এলেই তো পার। তোমরা এলে কত ভাল লাগে। আমাদের পর ভেবো না যেন। পাশাপশি বাড়ী আমাদের। এ বাড়ীও তোমারই বাড়ী।

সুবাস ॥ একটা কারণে আসা হয়নি।

মলিনা ॥ কি কারণ, বাবা ?

সুবাস ॥ [নববধূর লজ্জায়] আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল কিনা।

মলিনা ॥ বেশ, বেশ। কবে বিয়ে ?

সুবাস ॥ শীগগিরই হবে। দিন ঠিক হয় নি এখনও। তবে পাকা কথা হয়ে গিয়েছে।

মলিনা ॥ বাঃ, সুখবর। পাত্রীটি কে ?

সুবাস ॥ আপনাদের চেনা। ঐ যে দশ নম্বরের শ্রীলতা—

মলিনা ॥ শ্রীলতা ? মানে নৃপেনবাবুর মেয়ে।

সুবাস ॥ হ্যাঁ।

মলিনা ॥ শ্রীলতার সঙ্গে তোমার আগে থাকতেই আলাপ ছিল বুঝি ?

সুবাস ॥ না—হ্যাঁ—একটু ইয়ে—বেশী নয়। বাবাই দেখে শুনে—অবিশ্যি আমারও মানে—বাবাই শেষ পর্যন্ত—

মলিনা ॥ তোমার বাবার পছন্দ হয়েছে ?

সুবাস ॥ হ্যাঁ। নইলে তো এ বিয়ে হোতোই না।

মলিনা ॥ বোসো বাবা। লিলিকে সুখবরটা দিই। ও শুনলে খুব খুশী হবে। [জোরে ডাকে] লিলি, লিলি।

[লিলি ছুটতে ছুটতে এসে ঢোকে। পাকা তরুণী। পাঁড় প্রগল্ভা। কথার সুরে ইঙ্গবঙ্গী দোআঁশলা টান। কামানো ভুরুতে কালো, ঠোঁটে লাল, গালে গোলাপী, ঘাড়ে-গর্দানে সাদা। নখগুলো দীর্ঘ, ছুঁচোলো, রক্তাক্ত। চুল, তার বাক্যের মতই, হাওয়া দিয়ে ফাঁপানো। নারীসুলভ দৈহিক স্ফীতিকে স্ফীততর ঔদ্ধত্যে উড্ডীন রাখবার চেষ্টা সহজেই চোখে পড়ে। আপাদমস্তক পুরুষের প্রতি আমন্ত্রণলিপি মোটা অক্ষরে লেখা। অক্ষরগুলো এত মোটা যে অধিকাংশ পুরুষ দেখামাত্র পালায়।]

লিলি ॥ গুড্‌নেস্! সুবাসদা যে!

সুবাস ॥ [বিগলিতভাবে হেসে] হ্যাঁ। একটা সুখবর—

মলিনা ॥ সুবাস ওর বিয়ের কথা বলতে এসেছে। তোরা দু'জনে কথা বল। আমি ওর চা নিয়ে আসি। [মলিনার প্রস্থান]

লিলি ॥ সুবাসদা, কতক্ষণ এসেছো ?

সুবাস ॥ [আগের মতই বিগলিতভাবে] অনেকক্ষণ।

লিলি ॥ [ঠোঁট ফুলিয়ে] বারে, আমায় এতক্ষণ খবর দাওনি যে!

সুবাস ॥ মাসীমার সঙ্গে কথা বলছিলাম ?

লিলি ॥ [ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে] কি কথা ? বিয়ের ? যাক্ তবু এতদিনে তুমি বিয়ের কথাটা বলতে পারলে। আমি তো তোমার রকম-সকম দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম আর কি ! যাক, মা কি বললেন ?

সুবাস ॥ খুশী হলেন।

লিলি ॥ আর ? আর বললেন, লিলিকে বল, তাই না ?

সুবাস ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

লিলি ॥ [চোখের কোণে হেসে] তা বল আমাকে।

সুবাস ॥ বললাম তো।

লিলি ॥ হ্যাঁ, তোমার বাবা কি বললেন বিয়ের ব্যাপারে ?

সুবাস ॥ [খুশী] হ্যাঁ, বাবা রাজী হয়েছেন, লিলি।

লিলি ॥ আমি তো তোমায় হাজার দিন বলেছি যে আমার বাড়ীর জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি তোমার বাবাকে বল। আহা কাকাবাবু দেবতুল্য লোক। তিনি কি আমাদের বিয়েতে অমত করতে পারেন ? তা তুমি ভয়েই বলতে পারোনি এত দিন। জানো, এই লিলি চৌধুরী কখনও লোক চিনতে ভুল করে না। [কাছে গা ঘেঁসে আসে] হ্যাঁ গো, এত দিন আসনি কেন গো।

সুবাস ॥ [ঢোঁক গিলে] বিয়ের কথাবার্তা চলছিল কি না !

লিলি ॥ [আরো ঘেঁসে আসে] হ্যাঁ গো, বিয়ের কথা চলতে থাকলে বুঝি আর এ বাড়ীতে আসা যায় না ? এবার

থেকে কিন্তু রোজ এসো। এ বাড়ী তো বলতে গেলে এখন তোমার নিজেরই বাড়ী। এখন আবার লজ্জা-টজ্জা পেয়ে নিজের বাড়ীতে বসে থেকো না যেন।

সুবাস ॥ হ্যাঁ, তা—লিলি, একটু সরে বোসো, মাসীমা এসে পড়তে পারেন।

লিলি ॥ নাঃ। মা এখন রান্নাঘরে। আর এলেই বা কি। এলো তো ভারি বয়েই গেল। আমি বসে আছি তোমার কাছে—আর কারুর কাছে তো নয়। আর দু'দিন বাদে তো তুমি আমার—[হঠাৎ থেমে লাস্যভরে] কি বলো তো? পারলে না? তুমি যে কি লাজুক! আমার কিন্তু এখন আর একটুও লজ্জা করছে না। দু'দিন বাদে তুমি আমার বর—ওমা, ভাবলেও আমার গা-টা কেমন শিউরে উঠছে। দু'দিন না হয় বাকীই আছে। তা বলে এখন একটু পাশাপাশি বসতেও পারি না? যাই বল, তুমি কিন্তু বড় ভীরু। অবিশ্যি তোমার বাবা, হ্যাঁ, রাশভারি লোক বটে। দেখলে প্রথমটা ভয় লাগে, কিন্তু মনটা কি নরম—একদম পুডিং-এর মত। দেবতুল্য লোক। [নমস্কারের ভঙ্গীতে কপালে হাত ঠেকায়।] কি গো, অমন হাঁড়ির মত মুখ ক'রে ব'সে যে! শীগগির কথা বল। হাসো। একটু হাসো শীগগির। [সুবাস বিরসমুখের পটে এক চিলতে হাসি ফোটায়।] আহা কি হাসি! কিপটের মত। আচ্ছা এইবার, কথা বল। বল।

সুবাস ॥ কি বলব ?

লিলি ॥ [অভিমানক্ষুব্ধ] ও, বলবার নেই কিছু ! বেশ, আমিও তবে কথা বলব না। [মুখ ঘুরিয়ে বসে।]

সুবাস ॥ আহা, তুমি যে আবার ইয়ে---

লিলি ॥ আমি ইয়ে নই। আমি লিলি।

সুবাস ॥ হ্যাঁ, লিলিই তো।

লিলি ॥ হ্যাঁ, লিলি। কিন্তু এখন আমি কথা বলব না।

সুবাস ॥ আমি একটা কথা বলব ভাবছিলাম।

লিলি ॥ বলতে পারো তুমি। তবে আমি বলব না।

সুবাস ॥ বেশ, বেশ। না বললেও হবে। শুধু শুনলেই চলবে। আমি বলছিলাম কি, শ্রীলতা—

লিলি ॥ [হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে মুখোমুখি] কে ? শ্রীলতা ? শ্রীলতার আবার কি ?

সুবাস ॥ [ভীত] না, কিছু নয়।

লিলি ॥ না, কিছু আছে। ছাখো, ঢাকবার চেষ্টা কোরো না।

সুবাস ॥ না, না, ঢাকবার চেষ্টা করছি না। বলছিলাম কি, শ্রীলতার সঙ্গে আমার ইয়ে—

লিলি ॥ জানি, জানি। শ্রীলতার সঙ্গে তোমার একটু ইয়ে ছিল। আর কি হ্যাংলা মেয়ে, বাবা, তোমার পেছনে কি ঘোরাটাই না ঘুরেছে। নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে ! অবিশ্যি তোমারও বাপু একটু প্রশ্রয় ছিল। যাকগে, ও ল্যাঠা তো এখন চুকেই গেল। এখন যেন আসে শ্রীলতা তোমার পেছনে ঘুরতে, চুলের মুঠি ছিঁড়ে নেব

তাহলে, ঠ্যাং খোঁড়া করে ছেড়ে দেব। আর বিয়ের আগে যা হ'য়ে গেছে হোক গে, এখন কিন্তু আর তুমি ওর দিকে একটি বারও তাকাতে পারবে না। বাড়ী থেকে বেরোবার সময় দশ নম্বরের সামনে দিয়ে যাবে না। বাঁ দিকের গলি দিয়ে ঘুরে যাবে। বুঝেছ ?

সুবাস ॥ হ্যাঁ !

লিলি ॥ বলি, কাণে কিছু ঢুকল ? যা বললুম ?

সুবাস ॥ হ্যাঁ।

লিলি ॥ মনে থাকে যেন।

সুবাস ॥ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

লিলি ॥ অবিশ্যি মেয়েটা যে খুব খারাপ তা নয়। ঠিক ফ্লার্ট নয়, তবে একটু হ্যাংলা। দেখতে—হ্যাঁ, টলারেব্‌ল্‌, তবে রোগাটে বড্‌ডো। শ্রীলতার মা অবিশ্যি বেশ লোক; মিষ্টি করে হেসে কথা বলেন, চা-সন্দেশ খাওয়ান। চেহারাটাও নাইস্‌। [হেসে] তুমি যদি শ্রীলতার বদলে শ্রীলতার মার দিকে দৃষ্টি দিতে, তবে তোমার রুচির আমি প্রশংসা করতুম।

সুবাস ॥ [কাণে আঙ্গুল দিয়ে] আরে ছি, ছি, ছি।

লিলি ॥ [আরো হেসে] অত ছিছি-র কি হ'ল! সত্যিই তো আর শ্রীলতার মা তোমার শাশুড়ী নন। তোমার শাশুড়ী—ঐ আসছেন।

[রসগোল্লা-নিমকির ডিস ও জলের গ্লাস নিয়ে মলিনা ঢোকে।]

মলিনা ॥ একটু মিষ্টি-মুখ করো বাবা। গরীব মাসীর বাড়ীতে এর পর কি আর এত আসবার সময় হবে! তখন শ্বশুরবাড়ীতে যেতে হবে। তা শ্রীলতার মা তোমার আদর-যত্ন খুব করবে, বুঝলে। এ ব্যাপারে ওর হাত খুব দরাজ। আর শ্রীলতাও অবিশ্যি মেয়ে খুব ভাল। আর তোমার সঙ্গে মানাবেও চমৎকার।

লিলি ॥ [ভুলটা বুঝতে পারে। ওর মুখের চেহারা বদলে যায়] হ্যাঁঃ! চমৎকার মানাবে! বরের কুমড়োর মত চেহারা আর কনের চেহারা প্যাঁকাটির মত।

মলিনা ॥ হ্যাঁ, শ্রীলতা একটু রোগা বটে, তবে মুখটা খারাপ নয় তো।

লিলি ॥ না, খুব ভাল। সামনের দিকে মূলোর মত দুটো গজদন্ত।

মলিনা ॥ রংটা আবার কত ফর্সা!

লিলি ॥ হ্যাঁ, অ্যানিমিয়া আছে ওর। রক্তশূন্য হ'লে আমরাও অমন ফর্সা হতুম।

মলিনা ॥ মুখটা কিন্তু মিষ্টি যাই বলিস লিলি।

লিলি ॥ মিষ্টি না ছাই! গালের হাড় দুটো হনুমানের মত উঁচু।

মলিনা ॥ কি জানি বাপু, তোমার কি ভাল লাগে। যাই হোক, সুবাসের ভাল লেগেছে তো তাহলেই হ'ল।

লিলি ॥ সুবাসদার ভাল লেগেছে কে বললে!

মলিনা ॥ তবে?

লিলি ॥ সুবাসদার খুব খারাপ লাগে শ্রীলতাকে।

মলিনা ॥ হ্যাঁ বাবা সুবাস তাই নাকি ?

সুবাস ॥ কই না—তা—মানে—না—

লিলি ॥ ও মাই গুড্‌নেস্‌! মানুষ এত মিথ্যেও বলতে পারে!

সুবাস ॥ অ্যাঁ! মিথ্যে!

লিলি ॥ মিথ্যে নয় ?

সুবাস ॥ কই, আমি শ্রীলতার নামে কখন কি বললুম ?

লিলি ॥ আহা, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানো না। মার সামনে দিব্যি ভাল মানুষ সাজছ। মুখে না বললেই বুঝি কিছু আর বলা হ'ল না ? আমি একটু আগে যখন শ্রীলেখার নিন্দে করছিলুম, তখন তুমি চুপটি করে শুনছিলে কি না, বল সত্যি করে, বল। আর শাস্ত্রেই আছে মৌনসম্মতিলক্ষণম্‌। তাহলে প্রকারান্তরে শ্রীলেখাকে তোমারই নিন্দে করা হ'ল কিনা ? আর যাকে ভাল লাগে তাকে কি কেউ নিন্দে করে ?

মলিনা ॥ ও সব কথা থাক। সুবাস, বাবা, তুমি জলখাবারটুকু খেয়ে নাও।

লিলি ॥ সুবাসদা কি আর এই বাজে খাবার এখন খেতে পারবে ? শ্রীলতার বাড়ীতে রোজ খেয়ে খেয়ে ওঁর তো এখন জিভের জাত বদলে গেছে। আমি তো ভাবতেই পারিনা মা, পুরুষ জাতটা এত হাবাতে কি করে হয় যে শুধু খাইয়ে একটা কদাকার মেয়ে অপ্সরী বনে যায়!

সুবাস ॥ [অনুনয়ের সুরে] অমন ক'রে ব'ল না লিলি। মাসীমা, ওকে একটু বারণ করুন না।

লিলি ॥ ওঃ, বৌর সম্বন্ধে সত্যি কথাটা শুনতে পারছ না বুঝি? না কি তোমার নিজের সম্বন্ধে? তবু শ্রীলতার সব কথা তো বলিনি। শ্রীলতা যে এর আগে অন্তত আরো পাঁচটা ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে তা কে না জানে! পুরুষ জাতটা অন্ধ ব'লে তো আর একটা অসভ্য মেয়ে রাতারাতি ভাল হয়ে যাবে না। শেষটায় তো ও একটা মোটর ড্রাইভারের সঙ্গে লটকে গিয়েছিল। হাউ হরিব্‌ল্!

সুবাস ॥ লিলি, তোমার কথাও কিন্তু তাহলে আমি বলে ফেলব, হ্যাঁ।

লিলি ॥ বল না। আমি কি ভয় পাই?

মলিনা ॥ আঃ, তোরা চুপ কর তো।

লিলি ॥ কেন চুপ করব? কি বলবে ও বলুক না। আমি কি ভয় করি? সুবীরের নাম বলবে তো? হ্যাঁ, সে ছেলেটা আমার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াত। আমি তাকে পাত্তা দিইনি। এটা যদি দোষ হয় তো বেশ। আর কি বলবে? বীরেনের কথা? হ্যাঁ, সে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। বন্ধুত্বকে যারা কলুষিত ক'রে ত্যাখে তাদের আমি ঘৃণা করি। আর কার কথা বলবে? অংশুদা? অংশুদা আমার মাষ্টার ছিলেন ছোটবেলা থেকে। তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করি। তিনি আমাকে স্নেহ করেন। তিনি আমায় যাদুঘর-চিড়িয়াখানা-সিনেমা এই-সব দেখাতে নিয়ে যেতেন—শিক্ষামূলক ভ্রমণ সেগুলো।

এ সবও যদি দোষ হয় তো হোক। আর কার কথা বলবে? অবনীবাবু?

মলিনা॥ আঃ, থাম তো লিলি।

লিলি॥ থামব কেন? ও আমায় ভয় দেখাতে এসেছে! কাউকে ডরাই না আমি। উনি এসেছেন আমার কেচ্ছা গাইতে হুঁঃ। তোমার গুণের কথাও বলতে পারি, বুঝলে সুবাসদা।

সুবাস॥ (ঘাবড়ে গিয়ে) আমার আবার কি? আমি তোমাদের মতন নই, হ্যাঁ। কোন মেয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না।

লিলি॥ সম্পর্ক পাতানোর জন্যে চেষ্টার ত্রুটি কর নি। কিন্তু অমন ভীতু আর ক্যাবলা ছেলেকে মেয়েরা পা দিয়েও ছুঁয়ে ছ্যাখে না।

সুবাস॥ লিলি, চুপ কর। যা জানো না তা নিয়ে বাজে কথা ব'ল না। ঐ যে শুভা বলে মেয়েটা—বরুণের বোন—সে আমার জন্যে কি রকম পাগল হয়েছিল জানো? তার পরে শ্যামলী যে সুইসাইড করল সে কার জন্যে?

লিলি॥ তবে তুমি কোন ভালটা হ'লে?

সুবাস॥ তা আমি কি করতে পারি! আমার জন্যে কেউ সুইসাইড করলে আমি কি করব?

লিলি॥ থামলে কেন? তোমার প্রেমিকাদের নামের পূরো লিষ্টটা শুনি। বল আর কে কে সুইসাইড করল।

সুবাস॥ এই ধরগে—তুমি—

লিলি ॥ আমি? তোমার মত পুরুষ নামের অযোগ্য পদার্থের জন্য সুইসাইড করব? ভীরু, ক্যাবলা, কপর্দকহীন।

সুবাস ॥ আমরা কপর্দকহীন? জানো আমাদের কত টাকা আছে?

লিলি ॥ জানি, তোমার বাবা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হয়ে লাখ কয়েক টাকা সরিয়েছিলেন, তাইতে তোমাদের বাবুগিরি। শুভা শ্যামলী শ্রীলতা তো সেই চোরাই টাকা দেখেই মজেছে। ঐ সব বাজে মেয়েরা টাকায় ভোলে, আমার মত মেয়ে তাতে ভোলে না, হ্যাঁ, জেনে রাখো।

মলিনা ॥ (বাকযুদ্ধটি থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেই যাচ্ছেন) আঃ থাম তোরা।

সুবাস ॥ মাসীমা, আমার বাপ তুলেছে লিলি। আমার বাবাকে চোর বলেছে।

লিলি ॥ চোরকে কি সাধু বলবে?

সুবাস ॥ মাসীমা, আমায় যা খুসি তাই বলেছে আমি চটি নি। বাবাকে যা-তা বললে কিন্তু আমি এইবার রেগে যাব।

মলিনা ॥ না বাবা তুমি রেগো না। তুমি জলখাবারটা খাও। লিলি, থাম।

লিলি ॥ ও জলখাবারে কি সুবাসদার মন উঠবে মা? শ্রীলতার মা ওঁকে রোজ যা খাইয়েছে, তার পরে এ সব তো তেতো মনে হবে। ওঃ, পুরুষগুলো কি ভেড়া, সত্যি! শ্রীলতার মা যে সন্দেশের নামে টোপ খাওয়াচ্ছিল এটুকু বোঝবার ক্ষমতাও নেই। শ্রীলতার

মার শয়তানী বুদ্ধিটাও খুব শানানো। কি ক'রে ছেলে পাকড়াতে হয় তা জানে। ফার্স্ট ক্লাস ছেলেধরা।

সুবাস ॥ মাসীমা, আমি কিন্তু এবার কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারব না। আমি কিন্তু নিশ্চয়ই রেগে যাব।

মলিনা ॥ না বাবা, রেগো না। লিলি থাম তো। সুবাস, তুমি জলখাবারটা খেয়ে নাও বাবা।

সুবাস ॥ না, আমি খাব না। আমি চললুম মাসীমা।

মলিনা ॥ না বাবা, সে কি হয়! জলখাবারটা খেয়ে যাও। এ বাড়িতে এসে অমন রাগ ক'রে গেল আমি বড় দুঃখ পাব বাবা। আমার মেয়েটা ভারি বেয়াড়া। লিলি, ভুলে যেয়ো না, সুবাস আমাদের অতিথি। আমি চা-টা নিয়ে আসছি, বাবা, এর মধ্যে তোমরা ভাব-সাব করে ফ্যাল। আমি যেন এসে দেখি তোমরা বেশ আগের মত হাসিখুসি। (প্রস্থান)

(দুজনে পাশাপাশি বসে থাকে। মধ্যে বেশ ফাঁক। কিছুক্ষণ নীরব। লিলি দু'একবার আড়চোখে সুবাসকে ছ্যাখে।)

লিলি ॥ কি, কথা বলছ না যে!

সুবাস ॥ কি বলব?

লিলি ॥ মা যে বলে গেলেন ভাব-সাব করতে। অবিশ্যি আমার মার কথা এখন তো তোমার কাছে ঝি-চাকরাণীর সামিল।

সুবাস ॥ না, না। এ তুমি কি বলছ, লিলি? আমি মাসীমাকে—
(ভক্তির আতিশয্যে তোতলা হয়ে যায়।)

লিলি ॥ আচ্ছা থাক মার কথা। তুমি কি আমার ওপর রেগে গ্যাছ?

সুবাস ॥ না। রাগব কেন?

লিলি ॥ রাগবে বলছিলে কি না!

সুবাস ॥ ভেবেছিলাম রাগব, কিন্তু রাগি নি।

লিলি ॥ যাক্, বাঁচা গেল। আমি আবার গোমড়া মুখ দেখতে পারি না। হাসো, তাহলে একটু, হাসো। (সুবাস তিক্তমুখে কান্না-কান্না ভাবে হাসে) ছাখো তো, এখন তোমায় কত সুন্দর লাগছে!

সুবাস ॥ (বিগলিত) আমায় তোমার সুন্দর লাগছে? কিন্তু একটু আগে যে আমায় বলছিলে—

লিলি ॥ কি বলছিলুম?

সুবাস ॥ সে আমি উচ্চারণ করতে পারব না।

লিলি ॥ বারে আমি মার সামনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলব নাকি যে তোমায় আমার ভাল লাগে!

সুবাস ॥ আমায় তোমার ভাল লাগে? সত্যি?

লিলি ॥ বরাবরই লাগে। শুধু আজ নয়। রোজ। যেন জানো না—আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। (লজ্জার ভঙ্গী করে) নটী বয়।

সুবাস ॥ না, সত্যই জানতুম না।

লিলি ॥ যাক, এখন জানলে তো! নাও, এবার রসগোল্লাটা

খেয়ে নাও। (সুবাস দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে হাতটা একটু বাড়ায়।) মা চামচ দেয় নি দেখছি। তোমার হাতে রস লেগে যাবে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমার মুখের মধ্যে ফেলে দিচ্চি। হাঁ কর। না, না, জিভ বার করতে হবে না। শুধু হাঁ। অ্যায়। ভেরি গুড।

(মলিনা ঢোকে কাপ নিয়ে, দৃশ্যটি দেখে দাঁড়ায়। একটু হেসে তক্ষুণি ফিরে যায়। এরা মলিনাকে দেখতে পায় না। লিলি সুবাসের গা ঘেঁসে আসে।

লিলি ॥ তুমি আমায় ক্ষমা কোরো, সুবাসদা। প্লীজ এক্স্-কিউজ মি।

সুবাস ॥ কেন, ক্ষমা ক'রব কেন? (ভাল করে বুঝতে পারে না কথাটা)

লিলি ॥ এই একটু আগে তোমায় যা-তা বললাম।

সুবাস ॥ না, না, তাতে কি হয়েছে? তুমিও আমায় ক্ষমা কোরো।

লিলি ॥ কেন? (কথার ফাঁকে ফাঁকে রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে।)

সুবাস ॥ কত অন্যায় করেছি তোমার ওপর।

লিলি ॥ কি রকম?

সুবাস ॥ এই যে শ্রীলতাকে বিয়ে করা—এটাই কি কম অন্যায় হচ্ছে?

লিলি ॥ তেমন অন্যায় বুঝলে কোরো না। অবিশ্যি আমার এ ব্যাপারে কিছু বলা মোটেই ভাল দেখায় না, বুঝতেই

পারছ। তবে নেহাৎ ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই আলোচনা করা, এই যা। আর, ন্যায়-অন্যায় তো মানুষের মনে। তুমি অন্যায় মনে না করলেই অন্যায় নয়।

সুবাস ॥ না লিলি, তুমি বুঝতে পারছ না। এটা খুবই অন্যায় হয়েছে।

লিলি ॥ কেন, অন্যায় কেন ?

সুবাস ॥ তোমার সঙ্গে আমার সেই ছোটবেলা থেকে আলাপ, তাই কি না ?

লিলি ॥ নিশ্চয়ই। ছোটবেলায় আমরা কত বৌ-বৌ খেলেছি।

সুবাস ॥ তোমার সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা, সত্যি কি না ?

লিলি ॥ বটেই তো। তোমাতে আমাতে কতদিন লেকের ধারে বেড়াতে গেছি।

সুবাস ॥ তবে ?

লিলি ঃ তবে ?

সুবাস ॥ অন্যায় হচ্ছে না তাহলে ?

লিলি ॥ হ্যাঁ, তা হচ্ছে। তবে কি করবে ভাবছ ?

সুবাস ॥ এর আর ভাবাভাবির কি আছে ? শ্রীলতাকেই বিয়ে করব। বাবার আদেশ না মেনে পারব না আমি। বাবার কষ্ট দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।

লিলি ॥ তা তো বটেই। আমার আর কিছু নয়, আমার শুধু দুঃখ হয় তোমার জন্য। রিয়েলি, আই অ্যাম্ সরি ফর্ ইউ।

সুবাস ॥ কেন ?

লিলি ॥ তোমার মত এমন সুপুরুষ সুন্দর বুদ্ধিমান ছেলের

জন্য তোমার বাবা একটু ভাল করে মেয়ে খুঁজলেন না বা তোমার মনটাও তলিয়ে দেখলেন না, এটা খুবই দুঃখের কথা।

সুবাস ॥ না, লিলি, বাবা মেয়ে খোঁজেন নি, একথা সত্যি নয়। বাবা তেত্রিশটা মেয়ে দেখেছেন আমার জন্য।

লিলি ॥ তবু তোমার মনটা ওঁর বোঝা উচিৎ ছিল। আর—

সুবাস ॥ বাবা আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন তো। আমি শ্রীলতার—

লিলি ॥ আর একটা রসগোল্লা খাও। (সুবাসের কথা মধ্যপথে রসগোল্লায় বাধা পেয়ে বিপথগামী হয়।) তোমার হাতটা কি সুন্দর! (রসগোল্লার আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে হাতটা তুলেছিল সুবাস, লিলি ধরেছে সেই হাত।)

সুবাস ॥ তোমার হাতটাও খুব সুন্দর। (লিলির হাতটা ধরে)

লিলি ॥ (হাতটা ছাড়িয়ে নেয়) সুন্দর না ছাই। এ হাত তো তোমার ভাল লাগে না।

সুবাস ॥ না, না। খুব ভাল লাগে সত্যি।

লিলি ॥ আমাকেই তোমার ভাল লাগে না তো—

সুবাস ॥ (চীৎকার করে) কে বলেছে লাগে না? কোন ব্যাটা বলেছে তোমাকে আমার ভাল লাগে না? আলবাৎ লাগে। হাজারবার লাগে।

লিলি ॥ আমিও তো তাই বলি। কিন্তু তুমি যে তোমার নিজের মন বুঝতে পার না। তুমি মনের গভীরে বেশ জানো

যে তুমি আমায় ভালবাসো, আমায় নইলে তোমার চলবে না, কিন্তু তুমি সচেতন মনে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছ না।

সুবাস। (কথাটা এইভাবে ঘুরে যেতে বিমূঢ়) কি বললে? কি বললে? আমি তোমায় ভালবাসি? তোমায় ছাড়া আমার চলবে না? অথচ আমিই জানি না ব্যাপারটা। সত্যি আমার মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

লিলি ॥ এই সাদা কথাটা বুঝতে মাথা গুলোবার কি আছে? এ কি একটা শক্ত অংক নাকি?

সুবাস ॥ না, অংক নয়। অংক তো তবু একটু-আটটু বুঝতে পারতুম। এ তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা আর একবার বল দেখি।

লিলি ঃ শোনো ভাল করে মন দিয়ে।

সুবাস ॥ হুঁ!

লিলি ॥ তুমি মনের গভীরে আমায় ভালবাসো। কিন্তু তুমি সেটা সম্পর্কে সচেতন নও আপনভোলা লোক বলে। আমায় ছাড়া তোমার চলবে না।

সুবাস ॥ নাঃ, বুঝতে পারছি না।

লিলি ॥ এ কি অমনি অমনি বোঝা যায় নাকি?

সুবাস ॥ তবে?

লিলি ॥ মনের গভীরে ডুব দাও। চোখ বোঁজো আগে। হ্যাঁ, এইবার মনের একেবারে অতলে ডুবে যাও। কি, এবার বুছতে পারছ?

সুবাস ॥ (চোখ খুলে অসহায়ভবে) না তো।

লিলি ॥ তোমার মাথায় একেবারে কিচ্ছু নেই। এই সহজ জিনিষটা বুঝতে পারছ না? কি করে যে বোঝাই। চোখ বুঁজে বুকে হাত দাও, আর মনটার গভীরে ডুব দাও।

সুবাস ॥ (চোখ বুজেই খোলে) কত গভীরে?

লিলি ॥ অনেক অনেক গভীরে। যত গভীরে তুমি পারো।

সুবাস ॥ অতটা হচ্ছে না। চোখ বুঁজে কিছু ভাবতেই পারছি না। খালি মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছি!

লিলি ॥ তবে? এই ছাখো, চোখ বুঁজলেই আমার মুখ তোমার চোখে ভাসছে। আচ্ছা, এর পরেও তোমাকে আমার বোঝাতে হবে যে তুমি আমায় ভালবাস? হায় রে, পোড়া কপাল। আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে একটা খুব সূক্ষ্ম ব্যথার মত কিছু লাগছে না? খুব ছোট এক চিল্‌তে বেদনা—ধরা যায় কি যায় না, মাঝে মাঝে চিড়িক করে ওঠে ফিকের ব্যথার মত।

সুবাস ॥ (বুকে হাত দেয়) না, অতটা নয়। তবে একটা ব্যথা আছে—এই বাঁ দিকে।

লিলি ॥ হ্যাঁ, বাঁ দিকেই তো হবে। ঐ দিকেই তো হার্ট।

সুবাস ॥ যে ব্যথাটার কথা তুমি বলছ, এটা বোধহয় সেটা নয়।

লিলি ॥ কেন?



প্রোপোজ কর আমার কাছে।

সুবাস ॥ আমার বুকে একটু সর্দি বসে গেছে, এ বোধহয় সেইটে।

লিলি ॥ না, না, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। সর্দির ব্যথা আর ভালবাসর ব্যথা দুটোর জাত একদম আলাদা।

সুবাস ॥ তা হবে। এটা বোধহয় তাহলে ভালবাসার ব্যথাই হবে।

লিলি ॥ এখন তাহলে বুঝতে পেরেছ ?

সুবাস ॥ সবটা নয়। তবে একটু—হ্যাঁ একটুখানি—

লিলি ॥ একটু একটু করেই বুঝতে হয় এসব জিনিষ। একেবারে কি অতটা বোঝা যায় ?

সুবাস ॥ বোধহয় তাই।

লিলি ॥ তা বুঝে-শুনে চুপচাপ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন ?

সুবাস ॥ কেন, কি করব ?

লিলি ॥ একটা মেয়েকে ভালবাসো এটা বেশ বুঝতে পেরেও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

সুবাস ॥ (অসহায়ভাবে) কি করব আমি ?

ললি ॥ একটু সক্রিয় হও—মানে অ্যাক্‌টিভ্‌।

সুবাস ॥ কি করে অ্যাক্‌টিভ হব ?

লিলি ॥ নাঃ, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। সেই মেয়েটির কাছে এখন প্রেম নিবেদন কর।

সুবাস ॥ সেই মেয়েটি মানে তো তুমি।

লিলি ॥ হ্যাঁ। আমাকে ভালোবাসো জেনেও তুমি আমার কাছে প্রেম নিবেদন করবে না ? প্রোপোজ কর আমার কাছে।

সুবাস ॥ করব ? কি করে প্রেম নিবেদন করতে হয় ?

লিলি ॥ আঃ, তাও আমায় শিখিয়ে দিতে হবে ? নাও দাঁড়াও। আমার গা ঘেঁষে এসো। তারপরে আমার হাতটা ধরে বল—(সুবাস শক্তভাবে পাশে দাঁড়ায় ও দৃঢ় মুষ্টিতে হাতটা ধরে।) আহা-হা অত জোরে নয়। হাতে লাগছে আমার।

সুবাস ॥ (অপ্রস্তুত) দুঃখিত, দুঃখিত।

লিলি ॥ মোলায়েম করে ধর। হোল্ড ইট্ টেণ্ডারলি।

সুবাস ॥ ধরেছি।

লিলি ॥ এবার বল।

সুবাস ॥ কি বলব ?

লিলি ॥ আঃ যন্ত্রণা ! সেটুকুও আমায় বলে দিতে হবে।

সুবাস ॥ (কাঁচুমাচু মুখ এখন কাঁদ-কাঁদ) আমি জানি না যে।

লিলি ॥ বল—লিলি, আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমায় বিয়ে করব।

সুবাস ॥ অ্যাঁ ?

লিলি ॥ (ধমকের সুরে প্রায়) অ্যাঁ কি ? বল। গো অন্।

সুবাস ॥ (যান্ত্রিকভাবে মুখস্ত পড়ার মত বলে) লিলি তোমায় আমি ভালবাসি। তোমায় আমি—অ্যাঁ তারপরে কি ?

লিলি ॥ আঃ, মাথায় একেবারে কিচ্ছু্ই নেই।

সুবাস ॥ ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমায় আমি বিয়ে করব। (লিলি সলজ্জ ভঙ্গীতে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়) কি, কথা

বলছ না যে? আর কিছু বলতে হবে আমায়? ঠিক বলা হয়েছে তো?

লিলি ॥ হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে।

সুবাস ॥ তবে কথা বলছ না যে?

লিলি ॥ পুরুষের প্রেম মনোমত হলে মেয়েরা বুঝি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে জানাবে যে তার ভাল লেগেছে?

সুবাস ॥ তবে?

লিলি ॥ আনন্দ হবে। কিন্তু আবার লজ্জাও পাবে। দেখলে না তোমার বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি কি রকম লজ্জায় মুখটা ঘুরিয়ে নিলুম। ছ্যাখো নি?

সুবাস ॥ হ্যাঁ দেখেছি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনি। আমার মাথায় কিছু নেই কিনা! (আন্তরিক দুঃখিত)।

লিলি ॥ কে বলেছে তোমার মাথায় কিছু নেই? কে সে মিথ্যুক? লায়ার!

সুবাস ॥ তুমিই তো বললে।

লিলি ॥ আমার জিনিষ আমি যা খুশী তাই বলতে পারি। আমার পাঁটা ল্যাজেও কাটতে পারি ইচ্ছে করলে। অন্য লোক বললে দেখিয়ে দেব না মজা, হ্যাঁ। আমার স্বামীর হয়ে আমাকে সব সময়ই দাঁড়াতে হবে, সে যাই হোক না কেন। এখন আর তুমি স্বামী ছাড়া কি বল! কথা একবার হয়ে গেলেই তো স্বামী। আমরা হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমরা ছোটবেলা থেকে তাই জানি। এখন কি তুমিই আর কাউকে বিয়ে

করতে যেতে পারো ? (বিমূঢ় সুবাসের বুকের কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে) জানি, তা তুমি পারো না। জানি তো তুমি আমায় কত ভালবাসো। বরং আমারই সন্দেহ হয়, আমি তো অতি ক্ষুদ্র, কতটুকু আমি তোমায় দিতে পারি ? তবু তুমি যে আমায় ভালবেসেছ, সে তোমারই মহত্ত্ব, আমার কিছু নয়।

(লিলি সুবাসের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসবার সময়ই ঘরে এসেছেন শোভনবাবু—সুবাসের বাবা। প্রকাণ্ড ভোজপুরী গোঁপ। রাশভারী লোক। ঢুকেই দৃশ্যটি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। এবার গলা খাঁকারি দিলেন।)

লিলি ॥ (লাফ দিয়ে সরে যায়) কাকাবাবু!

সুবাস ॥ অ্যাঁ! বাবা! (প্রায় কেঁদে ফেলে) আমার কোন দোষ নেই, বাবা।

শোভন ॥ লিলি, তোমার বাবা আছেন ?

লিলি ॥ (বেশ নার্ভাস) বাবা তো বেরিয়ে গেছেন। মা আছেন। ডাকব ?

(চায়ের কাপ হাতে মলিনার প্রবেশ)

মলিনা ॥ আর ডাকতে হবে না।

শোভন ॥ বৌদি কি জানতেন নাকি যে আমি এসেছি! একেবারে চা-র কাপ হাতে নিয়ে হাজির।

মলিনা ॥ আপনাকে চা পরে দিচ্ছি। এটা আপনার ছেলের।

শোভন ॥ (প্রথমে ছেলের দিকে ও পরে অর্ধসমাপ্ত খাবারের দিকে তাকান।] হুঁ।

সুবাস ॥ না, না, আমি না হয় পরে খাব। বাবাকে দিন না।

মলিনা ॥ (চায়ের কাপ সুবাসের সামনে রাখে) সুবাসের বিয়ে তাহলে পাকা হয়ে গেল।

শোভন ॥ হ্যাঁ, সেই খবর দিতেই তো এলাম। তা খবর তো আগে থাকতে নিজেই এসে পৌঁছেছে দেখছি।

মলিনা ॥ যাক, নিশ্চিন্দি। আপনার একটা দায়িত্ব কমলো। আর শ্রীলতা মেয়েটিও বেশ ভাল। আমি দেখেছি তো। খুব ঠাণ্ডা মিষ্টি স্বভাব। বেশ বুদ্ধিমতী। আমার তো খুব পছন্দ। আমি খুব খুশী হয়েছি।

(লিলি দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে কেঁদে ওঠে—নিচু থেকে ক্রমে ওঠে চড়া পর্দায়। সুরটা মড়াকান্নার মার্জিত সংস্করণ।)

শোভন ॥ কি হল ?

মলিনা ॥ (কাছে গিয়ে) কি হল লিলি ? পেটের সেই ব্যথাটা নাকি ?

লিলি ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) মা, আমি আত্মহত্যা করব। এ প্রাণ আর রাখব না।

মলিনা ॥ কেন, কেন, কি হল ?

লিলি ॥ না, আমি আত্মহত্যা করব। তুমি আমায় বাধা দিতে পারবে না কিন্তু, আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি।

মলিনা ॥ আরে, আত্মহত্যা না হয় পরে করিস। এখন কি হয়েছে বলবি তো।

লিলি ॥ এর পরেও তুমি জিজ্ঞেস করছ—কি হয়েছে। কি হয়নি, আগে তাই বল। কি হতে আর বাকী আছে ?

মলিনা ॥ আঃ গেল যা। কি হয়েছে বলবি তো।

লিলি ॥ আমার কপাল পুড়েছে।

মলিনা ॥ কি করে পুড়ল ? খুলে বল সবটা।

লিলি ॥ (কান্নার নতুন তোড়) আ-মা-র ক-পা-ল—

শোভন ॥ (লিলির কাছে এসে সহানুভূতির স্বরে বলেন) কি হয়েছে বল মা আমায়।

লিলি ॥ (কান্না) কা-কা-বা-বু—

শোভন ॥ হ্যাঁ, বল ভয় কি! (লিলির কান্না চলতে থাকে) লজ্জা কোরো না। আমি থাকতে তোমার কোন ভাবনা নেই। বল মা।

লিলি ॥ কা-কা-বা-বু হো-ও-ও-ও।

শোভন ॥ বল মা।

লিলি ॥ সুবাসদা-আ-আ-আ।

শোভন ॥ বল, সুবাস কি করেছে ?

লিলি ॥ সুবাসদা আ-মা-য়—

শোভন ॥ তোমায় কি—বল। (হঠাৎ ধমকের সুরে সুবাসকে) অ্যাই রাস্কেল, কি করেছিস তুই ? শীগগির বল! নইলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

সুবাস ॥ (বিভ্রান্ত) না, না, আমি কিছু করি নি।

লিলি ॥ ও-মা-গো। আমি কোথায় যাবো গো! আজকেও এই একটু আগে ও বলল—

শোভন ॥ কি বলল—বলো।

লিলি ॥ বলল—(হঠাৎ লজ্জার ভঙ্গীতে থামে।)

শোভন ॥ বল মা, বিপদ-কালে লজ্জা করতে নেই।

লিলি ॥ সুবাসদা আমায় জড়িয়ে ধরে বলল—(আবার লজ্জার ভঙ্গীতে থামে)

শোভন ॥ বল। লজ্জা নেই। আমি তোমার বাপের বয়সী।

লিলি ॥ বলল—লিলি, আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমায় বিয়ে করব।

শোভন ॥ এই রাস্কেল কথা বলছিস না যে। বলেছিস?

সুবাস ॥ হ্যাঁ—তা মানে—

শোভন ॥ আর কোন মানে-টানে নেই এর। তুমি যখন লিলিকে কথা দিয়েছ, তখন এখানেই তোমার বিয়ে হবে।

সুবাস ॥ আমার কথাটা—

শোভন ॥ তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। চুপ করে থাকো। লিলিকেই তোমার বিয়ে করতে হবে। ফুলে ফুলে মধু খাওয়ার চেষ্টাকে আমি ঘৃণা করি। (মলিনাকে) বৌদি আপনার অমত নেই তো?

মলিনা ॥ না, আমার—

শোভন ॥ ব্যাস, তা হলে এই বিয়েই ঠিক রইল। মা তুমি কেঁদো না। চোখের জল মোছো। (লিলি চটপট চোখের জল মুছে স্মার্ট হয়ে দাঁড়ায়।)

মলিনা ॥ কিন্তু শ্রীলতার বাড়িতে—

শোভন ॥ হ্যাঁ, আমায় একটু অসুবিধেয় পড়তে হবে বটে। তা



কবিরা বলে গেছেন—যে ভালবাসে সে-ই কাঁদে।

এমন পুত্তুর যার, তার কপালে এ অঘটন তো লেখাই রয়েছে। যাকগে, সে ওদের ভাল করে বুঝিয়ে বলে ক্ষমা চাইতে হবে।

মলিনা ॥ চলুন ঠাকুরপো, আমরা ও ঘরে গিয়ে বসি। ওরা ওদের মধ্যেকার ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলুক।

(ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে শোভন তাকায় সুবাসের দিকে, তারপর মলিনা সহ বেরিয়ে যায়।

লিলি হেসে সুবাসের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ায়।)

লিলি ॥ কি গো, এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো যে তুমি আমায় ভালবাসো! সত্যি, তুমি কেমন লোক বল তো। নিজের মনটা পর্যন্ত ভাল করে বোঝো না। অবিশ্যি সেইজন্যই আরো বেশী ভাল লাগে তোমায়। আর তুমি তো লজ্জায় বাবার কাছে বলতেই পারতে না। ছ্যাখো তো কেমন বুদ্ধি করে আমি ব্যবস্থাটা করে ফেললুম। (লিলির আদরের প্রত্যুত্তরে সুবাস কাঠ হয়ে বসে থাকে। তারপরে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফ্যালে।) আহা, প্রেমের কান্না! এতদিনে তুমি বুঝতে পেরেছ যে তুমি আমায় ভালবাসো। কবিরা বলে গেছেন—যে ভালবাসে সে-ই কাঁদে। আমারও কাঁদতে ইচ্ছে করছে গো-ও-ও-ও। (কাঁদতে আরম্ভ করে। সুবাস দম নিতে যেই থামে, লিলি তখন জোরে ধরে কান্না। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে কাঁদতে থাকে দুজনে।)

যবনিকা

